১০ই নভেম্বর স্মরণে

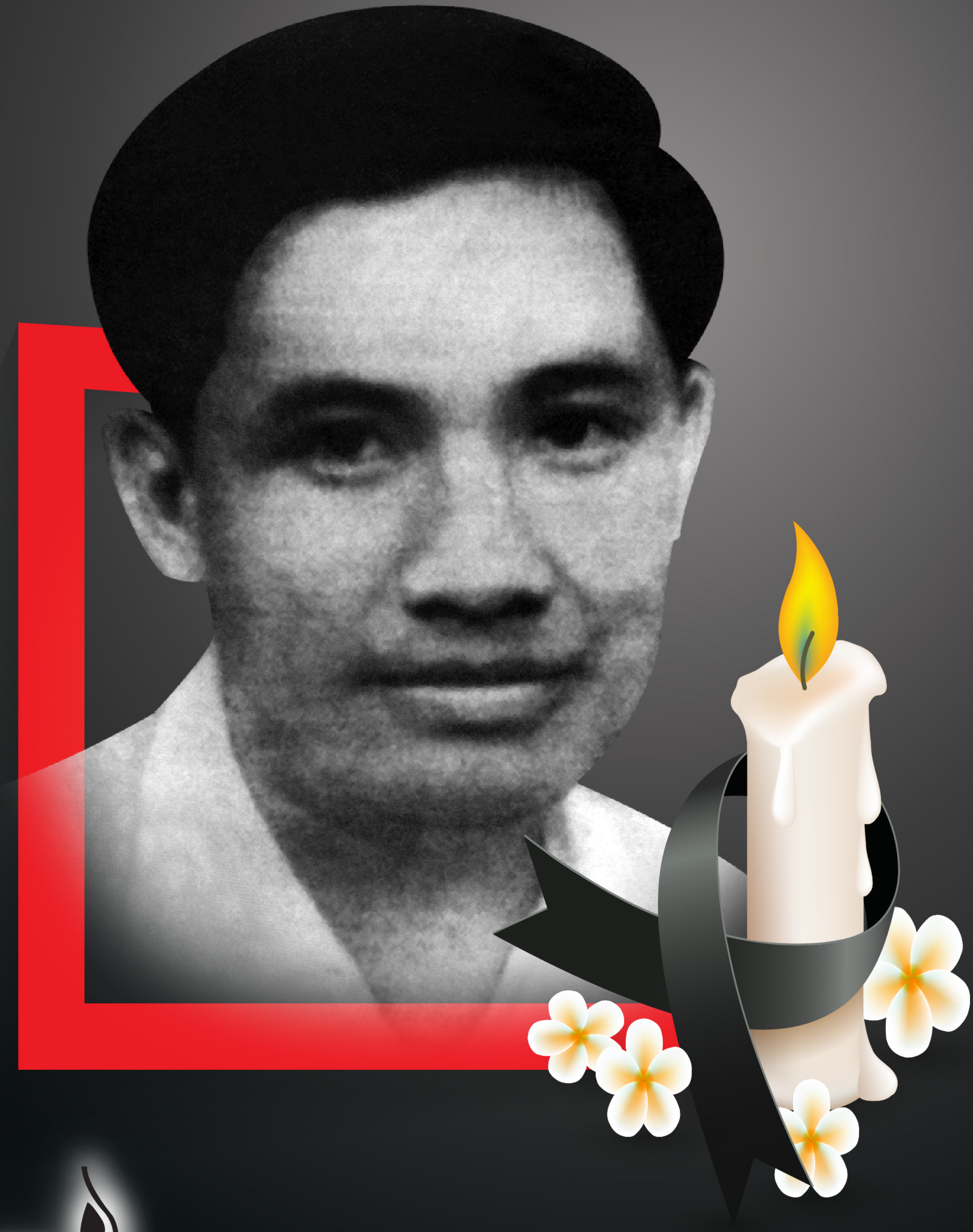

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

১০ই নভেম্বর স্মরণে

প্রকাশ:
১০ নভেম্বর ২০২০

প্রচ্ছদ ছবি:

প্রকাশনায়:
তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি
কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি
ফোন: +৮৮-০৩৫১-৬১২৪৮
ই-মেইল: pcjss.info@gmail.com
ওয়েব: www.pcjss.org

মূল্য: ৫০ টাকা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ০৪
মহান নেতা এম এন লারমার ৩৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা ০৫

প্রবন্ধ ১২-৭০
মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন– মঙ্গল কুমার চাকমা ১২
মঞ্জুকে দেখেছি– ডা: ভগদত্ত খীসা ২৯
মহান নেতা এম এন লারমার সাথে শেষ দেখা– সত্যবীর দেওয়ান ৩২
'আমি বাঙালি নই'– ত্রিজিনাদ চাকমা ৩৮
নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষেরই একজন সত্যিকার নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা– বাচ্চু চাকমা ৪০
রাষ্ট্রীয়ভাবে বর্ণবাদ ও ঔপনিবেশিকতার দৃষ্টিভঙ্গিতে শাসিত পার্বত্য চট্টগ্রাম– নিপন ত্রিপুরা ৪৩
পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যাকে উন্নয়নের প্রলেপ দিলেন ওবায়দুল– সজীব চাকমা ৪৭
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি: শেখ হাসিনা সরকারের প্রহসন ও প্রতারণা– প্রীতিবিন্দু চাকমা ৫২
পার্বত্য চট্টগ্রামে বহুমাত্রিক সমস্যার ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পটভূমি– শাহরিয়ার কবীর ৫৯
জনসংহতি সমিতির মুখপাত্র ড. রামেন্দু শেখর দেওয়ান– মঙ্গল কুমার চাকমা ৬৩
রক্তেভেজা সীমারেখা– প্রধীর তালুকদার (রেগা) ৬৮

কবিতা
খুব বেশি দেরি নেই– হাফিজ রশিদ খান ৭১
জয় হবে প্রগতির– সম্রাট সুর চাকমা ৭২
সেদিন ভোর হতে পারেনি– শরৎ জ্যোতি চাকমা ৭২

বিশেষ প্রতিবেদন ৭৪-৮০
পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাধে চলছে জুম্মদেরকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিতকরণ ৭৪

সম্পাদকীয়

আজ মহান বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৩৭তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জনগণের জাতীয় শোক দিবস। ১৯৮৩ সালের ১০ই নভেম্বরের এই দিনে জাতীয় কুলাঙ্গার বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের বিশ্বাসঘাতকতামূলক অতর্কিত আক্রমণে মহান নেতা এম এন লারমা আটজন সহযোদ্ধাসহ শহীদ হয়েছেন। জুম্ম জনগণ হারিয়েছে জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, সাবেক গণপরিষদের সদস্য ও সাবেক সাংসদ, মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে।

এই শোকাবহ দিনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছে মহান নেতার অমূল্য আত্মত্যাগকে। সেই সাথে স্মরণ করছে ১৯৮৩ সালের ১০ই নভেম্বরের এই দিনে মহান নেতা এম এন লারমার সাথে শাহদাৎবরণকারী আটজন সহযোদ্ধাসহ জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামে আত্মবলিদানকারী মহান শহীদদের। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে নানাভাবে অংশগ্রহণ করার কারণে অনেক সংগ্রামী ব্যক্তি বিভিন্ন কারাগারে অন্তরীণ হয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে পঙ্গুত্ব জীবন বরণ করেছেন, অসংখ্য নারী ও শিশু পাশবিক ও নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়ে অভিশপ্ত জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন, তাঁদের এই অমূল্য ত্যাগ ও অবদান জনসংহতি সমিতি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছে এবং সকল শহীদ, বন্দী, পঙ্গু কর্মী ও ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছে।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার একনাগারে প্রায় ১৩ বছর ক্ষমতায় থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। আর বর্তমান সরকার চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। সরকার চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে কেবল বন্ধ রাখেনি, চুক্তিকে পদদলিত করার লক্ষ্যে একের পর এক চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের মর্যাদা সংরক্ষণের পরিবর্তে বহিরাগত বসতিপ্রদান ও মুসলিম সেটেলারদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ চলছে এবং সেটেলারদের সংগঠিত করে পার্বত্যচুক্তি ও জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে নানাভাবে উস্কে দেয়া হচ্ছে।

দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামে চলছে প্রাণঘাতি মহামারী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব। কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে লকডাউনের ফলে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামেও চলছে একদিকে কর্মহীন হয়ে পড়া খেটে-খাওয়া মানুষের খাদ্য সংকট, অন্যদিকে করোনাভাইরাস সংক্রমণের আতঙ্ক। এ ধরনের চরম দুর্যোগ ও সংকটের মধ্যেও পার্বত্য চট্টগ্রামে থেমে নেই সেনাবাহিনী, বিজিবি ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান। জুম্ম গ্রামবাসীদের নানাভাবে হয়রানি ও উচ্ছেদ করে অবাধে চলছে দেশের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ও বহিরাগত ভূমিদস্যুদের ভূমি জবরদখল। ২০২০ সালে জুম্মদের জায়গা-জমি বেদখল, অবৈধ ধরপাকড় ও নির্যাতন, ঘরবাড়ি তল্লাসী, সেনাবাহিনী কর্তৃক সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে মদদ ইত্যাদি ফ্যাসীবাদী ঘটনা আরো বেশি জোরদার হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের পরিবর্তে শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকার পূর্ববর্তী স্বৈরশাসকদের মতো দমন-পীড়নের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের তৎপরতা জোরদার করেছে। ফলে ইতিমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল পথ একপ্রকার রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। পূর্বের সরকারগুলোর মতো বর্তমান সরকারও জুম্ম জনগণের জাতীয় পরিচিতি একেবারে বিলুপ্ত করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিকায়ন জোরদার করেছে।

সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের পরিবর্তে নতুন নতুন ক্যাম্প স্থাপন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল বিষয়ে সেনা নিয়ন্ত্রণ জোরদার করেছে এবং সন্ত্রাসী খোঁজার নামে পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে অবাধে সেনা অভিযান, ঘরবাড়ি তল্লাসী, নিরীহ ব্যক্তিদের গ্রেফতার ও মারধর করা হচ্ছে। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির পরিবর্তে পর্যটন, ইজারা প্রদান, ক্যাম্প স্থাপন, রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণা ইত্যাদির নামে প্রশাসনরে ছত্রছায়ায় জুম্মদের ভূমি জবরদখল ও উচ্ছেদ অব্যাহতভাবে করা হচ্ছে। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের ব্যর্থতাকে ধামাচাপা দিতে ও পরিস্থিতিকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে সেনাবাহিনী ও ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক সংস্কারপন্থী, ইউপিডিএফ ও এএলপি প্রভৃতি সশস্ত্র গোষ্ঠীসমূহকে মদদ দেয়া হচ্ছে। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে ধ্বংস করতে জনসংহতি সমিতির নেতা-কর্মীসহ চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে সোচ্চার ব্যক্তিবর্গকে 'সন্ত্রাসী', 'চাঁদাবাজ', 'অস্ত্রধারী দুর্বৃত্ত' হিসেবে পরিচিহ্নিত করতে অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্র জোরদার করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে মৌলবাদী ও জুম্ম বিদ্বেষী কিছু ইসলামী গোষ্ঠী কর্তৃক সুপরিকল্পিতভাবে আদিবাসীদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার কার্যক্রম অনেক আগে থেকে শুরু হলেও সাম্প্রতিককালে এর তৎপরতা অনেক জোরদার হয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। বিশেষত কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পরপরই বান্দরবান পার্বত্য জেলার আলিকদম উপজেলাসহ বিভিন্ন এলাকায় আদিবাসীদের এ ধরনের ধর্মান্তরিতকরণের ব্যাপক কার্যক্রমের খবর পাওয়া গেছে। যেখানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সম্মতি ও সহযোগিতা রয়েছে বলে স্বীকার করা হয়েছে।

বিগত ২২ বছরের অধিক সময়ে পার্বত্য সমস্যার কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধান হওয়া তো দূরের কথা, সমস্যা আরও জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের পরিবর্তে সরকার পূর্ববর্তী শাসকদের মতো দমন-পীড়নের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছে। ফলে ইতিমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফলে সরকার তথা রাষ্ট্রযন্ত্র জুম্মদের অধিকার আদায়ের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে গলাটিপে স্তব্ধ করা, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার জুম্ম কণ্ঠস্বরকে চিরতরে রুদ্ধ করা, জুম্মদের চিরায়ত ভূমি জবরদখল ও উচ্ছেদসহ জুম্মদেরকে জাতিগতভাবে নির্মূল করা এবং অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করা ইত্যাদি কার্যক্রম নির্বিঘ্নে বাস্তবায়ন করে চলেছে।

মহান নেতা এম এন লারমার ৩৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা এবং স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের সদস্য এম এন লারমার ৩৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এম এন লারমার ৩৬তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন জাতীয় কমিটি কর্তৃক ১০ নভেম্বর ২০১৯ এক স্মরণসভায় আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় এক সভা আয়োজন করা হয়। এম এন লারমার স্মরণে আয়োজক কমিটি নির্মিত অস্থায়ী শহীদ বেদিতে বিভিন্ন সংগঠনের পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি সমান্তরালে চলে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা স্মরণে কেন্দ্রীয় খেলাঘরের শিশু শিল্পীদের চিত্রাংকন। আয়োজনে অংশ নেন রাজধানীর বিভিন্ন স্কুল এবং কলেজের শিল্পী শিক্ষার্থীরা। এসব আয়োজনের পাশাপাশি চলে মূল আলোচনা সভা। জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক ডাকসুর সাবেক জিএস ডা: মুশতাক হোসেনের সভাপতিত্বে সভা পরিচালনা করেন এ কমিটির সদস্য সচিব হিরণ মিত্র চাকমা। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে নিয়ে চাকমা ভাষায় লেখা একটি বিখ্যাত গান দিয়ে আলোচনা সভার প্রারম্ভিকতা ধ্বনিত করেন আদিবাসী নারীদের প্রথম ব্যান্ড এফ-মাইনর। পরে উক্ত আলোচন সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন আয়োজক কমিটির অন্যতম সদস্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. রোবায়েত ফেরদৌস।

স্বাগত বক্তব্যের পর ১৯৮৩ সালে ১০ নভেম্বর পানছড়ির দুধুকছড়ার খেদারাছড়া থুমে শত্রুর বুলেটে নিহত হওয়া মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাসহ অন্য আট সহযোদ্ধার শাহদাৎ বরণকে কেন্দ্র করে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ড. জোবাইদা নাসরীন কণা। মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার পাশাপাশি একই ঘটনায় শহীদ হওয়া অন্য আট সহকর্মীর নাম এবং তাঁদের অবদানের কথা স্মরণ করে শোক প্রস্তাব শেষে উপস্থিত সকলেই দাঁড়িয়ে উক্ত ঘটনায় শহীদসহ সকল গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল সংগ্রামে আত্মাহুতি দেয়া মানুষদের জন্য এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার শহীদ বেদীতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৩৬তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন জাতীয় কমিটি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, জনসংহতি সমিতি, ওয়ার্কার্স পার্টি, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, বাসদ, বাংলাদেশ জাসদ, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন, জনউদ্যোগ, কাপেং ফাউন্ডেশন, আদিবাসী নারী নেটওয়ার্ক, বাগাছাস, আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফন্ট, ছাত্র ফেডারেশন, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, ম্রো ছাত্র সংগঠন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জুম সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংসদ, ঢাকাস্থ পাহাড়ী

ছাত্রবাস, গানের দল মাদল ও আদিবাসী নারী ব্যান্ড দল এফ-মাইনর, কেন্দ্রীয় খেলাঘর, রক্তদাতা সংগঠন জুবদা, হেবাং রেস্টুরেন্ট কর্তৃপক্ষসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং ছাত্র ও যুব সংগঠন।

পরে শহীদ বেদীতে ১০ নভেম্বরের শহীদদের স্মরণে প্রদীপ প্রজ্বলন করেন আপামর জনসাধারণ। এছাড়া উক্ত আয়োজনে চিত্রাংকনে অংশগ্রহণ করা শিশুশিল্পীদেরকে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সবশেষে আদিবাসী নারীদের প্রথম ব্যান্ড এফ-মাইনর, বিশিষ্ট শিল্পী কফিল আহমদ-এর পরিবেশনার পরে আদিবাসীদের গানের দল মাদলের পরিবেশনার মধ্য দিয়ে শেষ হয় উক্ত আয়োজন এবং মাদলের কন্ঠে সুর মিলিয়যে উপস্থিত সবাই কন্ঠ মেলান– 'তাই মিছিলে ধ্বনিত আজো মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, জানাই তোমায় লাল সালাম, জানায় তোমায় লাল সালাম।'

স্বাগত বক্তব্য: অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস
শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় কমিটির সদস্য

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৩৬তম মৃত্যুবার্ষিকীর আজকের এই অনুষ্ঠানে জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। গতকাল পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে ১০ নাম্বার মহাবিপদ সংকেত ছিল। এমন একটি ঐতিহাসিক যোগসূত্র কিনা আমরা জানি না। এম এন লারমা যে দিন মারা গেছেন সেই দিনও ১০ নাম্বার মহাবিপদ সংকেতের মধ্যেই একদল বিপথগামী এরকম বিপ্লবী জীবন নাশ করেছে। কিন্তু আমরা জানি শ্রীমৎ ভগবদ গীতায় বলা হয়েছে 'ন হন্যতে'। হন্য মানে শরীর। শরীরের মৃত্যু হতে পারে, শরীরের পতন হতে পারে কিন্তু মানুষের যে চেতনা, মানুষের যে স্পিরিট তার কিন্তু মৃত্যু নেই। হয়ত শারীরিকভাবে এম এন লারমা আমাদেরকে ছেড়ে গেছেন, কিন্তু তিনি যে বিপ্লবী চেতনা রেখে গেছেন সেগুলো আজও আমরা বহন করে চলি এবং সেগুলো নিয়ে আমরা সংগ্রাম করি।

এম এন লারমা বাংলাদেশের সংবিধানের সম্পর্কে তার মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেছেন। পার্লামেন্টে যে ডিবেইটগুলো হয়েছে সেগুলোর আমরা ভাল ফলাফল পেয়েছি, তাঁর বক্তব্য পেয়েছি। কাজেই সাংবিধানিক স্বীকৃতির একটি বড় জায়গা এম এন লারমার চিন্তার মধ্যে ছিল যে, সেটি খুব দরকার। কিন্তু সেখান থেকে আমরা বরং সংবিধানের মধ্যে আদিবাসীদেরকে বিভিন্ন নামে 'ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী', 'উপজাতি' অন্তর্ভুক্ত করেছি যেটা আদিবাসী জাতিসমূহের জন্য খুবই অপমানজনক। তারা যেমন মানতে পারে না, আমরাও মানতে পারি না। সেটা নিয়ে কিন্তু সংবিধান এখনো পর্যন্ত চলছে। আজকের স্বাগত বক্তব্যে সেই সংবিধানের কতগুলো বিষয় মনে করিয়ে দিতে চাই যে, আমাদের বিচ্যুতির জায়গাটি কোথায় এবং সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্র বিষয়ে নাগরিকদের রাজনৈতিক, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের স্বপ্ন, যে তাত্ত্বিক কাঠামোটার একটি প্রায়োগিক নির্দেশনা হচ্ছে সংবিধান। সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং ন্যায্য সংবিধান অর্জন কোন সহজ বিষয় নয়। এর জন্য বিবিধ ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে হয়, যেমনটি এ দেশের বাঙালি ও আদিবাসীরা '৭১-এ যুদ্ধ করেছিল। যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত যে দলিল তা আবশ্যিকভাবে একটি নাগরিক দলিল।

আমরা যেহেতু খুব ভুলে যাওয়া জাতি কিংবা বিস্মৃতিপ্রবণ, কাজেই আমাদেরকে কখনো ভুলে যেতে বাধ্য করা হয়, কখনো আমরা নিজেরাই ভুলে যায়। সেই কারণে আমাদের বার বার স্মরণ করতে হয় এবং অনেকে খুবই যৌক্তিকভাবে আশংকা ব্যক্ত করেন যে, স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্র ক্রমশ সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে এবং পড়ছে। বিভিন্ন বিষয়ে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক নীতি গ্রহণে যেসব চেষ্টা চলছে তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। যেটা জেনারেল এরশাদ করে গিয়েছিলেন আজ অব্দি তা রয়ে গেছে। আমরা কেউ পরিবর্তন করিনি। আমরা মনেকরি, একটি ধর্মকে রাষ্ট্রধর্মের বিশেষ সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়ায় ও অন্য ধর্মসমূহকে মর্যাদা না দেওয়ায় রাষ্ট্রধর্মের স্বীকৃতপ্রাপ্ত ধর্মের তুলনায় বাকি ধর্মগুলোর মর্যাদা আপনা আপনি খাটো হয়ে যায়। ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার ফলে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা এর মাধ্যমে রাষ্ট্রে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হয়েছে, এটা আমরা অনেকদিন থেকে বলে আসছি। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিবাদী বাঙালিরা রাষ্ট্রধর্মের প্রশ্নে যে কথা বলেছেন, রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তারা সেরকম বিতর্ক তুলেননি। আমাদের সংবিধানে ২(ক) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্ম প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে। তারপরের ৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। প্রজাতন্ত্রে অন্য ভাষাগুলো শান্তিতে পালন করা যাইবে কিনা আমাদের সংবিধান এ বিষয়ে ভয়ংকর নিশ্চুপ।

আমরা হয়ত এই তথ্য জানি না যে, এই দেশে বাংলার পরে অন্তত আরো ৩৫টি ভাষায় ৫৩টির বেশি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রায় ত্রিশ লক্ষ মানুষ এই ভাষায় কথা বলে। এতদ অঞ্চলে বাংলার পরে দ্বিতীয় কথ্য ভাষা সাঁওতাল। কিন্তু সে ভাষাগুলোর স্বীকৃতি আমরা আজও সংবিধানে পাইনি। অনেকেই আরো ভুল ব্যাখ্যা করেন যে, একুশ যে আজকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হয়েছে এটি বাংলাভাষার স্বীকৃতি না। এটি বাংলাকে মাতৃভাষা করার জন্যে বাঙালির যে লড়াই সেই লড়াইয়ের স্বীকৃতি। এর অনুবাদ হচ্ছে পৃথিবীর তাবৎ মাতৃভাষাকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং কোন একটি ভাষাকে আসলে নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না। কাজেই একুশের এই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আমরা স্বীকৃতি পেয়েছি। কিন্তু অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর যে ভাষা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মধ্যে তারা ক্রমশ ক্ষীণতর হচ্ছে। তাদের ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। দুই-একটি বাদে বাকিদের মাতৃভাষায় যে পাঠদানের কর্মসূচি সেটাও ঠিকমত এগুচ্ছে না। আজ পর্যন্ত কোন ভাষার জরিপই হয়নি যে, বাংলাদেশে কোন ভাষায় কত মানুষ কথা বলে এবং ভাষার পরিস্থিতি কেমন সেটিও নেই। কাজে এই যে ভাষা কেন্দ্রিক একটা জাতীয়তা বোধ তৈরি হয় সেটা কিন্তু অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে কিভাবে বিচ্ছুরিত হতে পারে সেটা আমরা আমাদের রাষ্ট্রের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না।

আমাদের সংবিধানে ২৭, ২৮ ধারায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান। কথাগুলো শুনতে ভালো। ২৭ এবং ২৮ এ আরো আছে, কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থানের কারণে কাউকে বৈষম্য করা যাবে না। কিন্তু আদিবাসীদের জীবনে সমতা নীতির জন্য এম এন লারমা যুদ্ধ করেছিলেন, লড়াই করেছিলেন। সেটি কি সত্য হয়েছে? রাষ্ট্রে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাটি আন্তরিকভবে নেয়া হয়েছে? যতটুকু বিধি প্রণয়ন হয়েছে আদৌ কি তা কার্যকর হয়েছে? রাষ্ট্র কি প্রকৃত অর্থে আদিবাসীদের অন্যদের মতন সমমর্যাদা সম্পন্ন নাগরিক মনে করে? আমাদের সংবিধানের ১৮ (ক) ধারায় বলা হয়েছে, রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যত নাগরিকের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ জীব বৈচিত্র্য জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণি সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবে। কিন্তু আমরা তো দেখি, জলাভূমি দখল হচ্ছে বনদস্যুদের দ্বারা, পর্যটন, ইকোপার্ক, তল্লাশি চৌকি, ক্যান্টনমেন্ট এর নামে হাজার হাজার বন দখলে যাচ্ছে। তথাকথিত উন্নয়নের নামে জীব-বৈচিত্র্য প্রতিদিন ধ্বংস হচ্ছে। এসব প্রকল্পের ফলে স্থানীয় মানুষদের উন্নয়ন তো হয়নি বরং তাদের দুঃখ-কষ্ট, বঞ্চনা আরও বেড়েছে। আদিবাসীরা নিজভূমে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ পুরো ৪৭ বছরে পদার্পণ করেছে। ভূ-রাজনীতি পাল্টে গেছে। তাই তেমন একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ন করা দরকার যেটা ১৯৭২ সালে এম এন লারমা চেয়েছিলেন। এ সংবিধানে অপরাপর জাতির পরিচয়, স্বীকৃতি, তাদের ভাষার স্বীকৃতি, সাংস্কৃতিক পরিচয়ের স্বীকৃতি নেই। বাংলাদেশ একটি বহুত্ববাদী রাষ্ট্র, এটি কেবল বাঙালির রাষ্ট্র, সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির রাষ্ট্র হতে পাওে না। এখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার বাসযোগ্য একটি দেশ গঠনের যে লড়াই এম এন লারমা করেছিলেন তা আজো আমাদের করে যেতে হবে। আপনাদের যারা এখনো লড়াই করছেন আপনাদের সাথে আমরা আছি।

শোক প্রস্তাব পাঠ: জোবাইদা নাসরীন কণা
শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও যুগ্ম আহবায়ক, জাতীয় কমিটি

জুম্ম জাতির মুক্তির সংগ্রাম, মানব জাগরণের অগ্রদূত, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, সাবেক সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৩৬তম মৃত্যুবার্ষিকী পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জাতি এবং সর্বোপরি দেশের সকল নিপীড়িত জাতি ও মানুষের জন্য এ এক গভীর শোকাবহ ও তাৎপর্যময় দিন।

১৯৮৩ সালে এদিনে দিবাগত রাতে পার্টির সুবিধাবাদী, উচ্চাভিলাষী ও ক্ষমতালীপ্সু গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের এক বিশ্বাসঘাতকতামূলক সশস্ত্র আক্রমণে গুলিবিদ্ধ হয়ে ৮ জন সহযোদ্ধাসহ সাহাদত বরণ করেন জুম্ম জনগণের প্রাণের মানুষ মহান বিপ্লবী এম এন লারমা। তাঁর এ মর্মান্তিক মৃত্যু জুম্ম জনগণের তথা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের এক অপূরণীয় ক্ষতি। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জনগণ যুগ যুগ ধরে সামন্ততান্ত্রিক, ঔপনিবেশিক ও উগ্র ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের শাসন-শোষণে নিষ্পেষিত হয়ে আসছে। একের পর এক শাসকগোষ্ঠীর ঘৃণ্যতম, বর্বরোচিত দমন-পীড়নে জর্জরিত হয়ে জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব যখন চরম অবলুপ্তির পথে ধাবিত হচ্ছিল ঠিক তখনি মুক্তির অগ্নিমন্ত্র নিয়ে আবির্ভূত হন অসাধারণ প্রতিভাধর মহান নেতা এম এন লারমা। তিনি জুম্ম জাতিকে প্রগতিশীল, জুম্ম জাতীয়তাবাদের চেতনায় জাগ্রত করে ঐক্যবদ্ধ করেন। তারই নেতৃত্বে জুম্ম জনগণের প্রথম রাজনৈতিক দল পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি প্রতিষ্ঠিত

হয় এবং জুম্ম জাতির দুর্বার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সূচনা ঘটে। এম এন লারমা ছিলেন জনগণের সত্যিকারের এক নেতা, মেহনতি মানুষের পরম বন্ধু। নেতা হিসেবে তিনি ছিলেন অসীম ধৈর্যশীল, মনোবল, আত্মবিশ্বাস ও পরমসহিষ্ণুতার অধিকারী। ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন আচার ব্যবহারে অমায়িক, সৎ, ক্ষমাশীল, নিষ্ঠাবান ও সাদাসিদা জীবন যাপনে অধিকারী। তিনি জুম্ম জনগণের পাশাপাশি বাংলাদেশে কৃষক, শ্রমিক, মাঝি-মাল্লা তথা শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের জন্য বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে আপোষহীন সংগ্রাম করে গেছেন।

তিনি ছিলেন নারী অধিকারের বলিষ্ঠ প্রবক্তা। পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে নারীকেও সে অধিকার প্রদানের জন্য তিনি ছিলেন সোচ্চার। তাই তিনি সত্যিকার অর্থে মানবতাবাদী মহান এক নেতা। এদেশের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে এম এন লারমার অবদান চিরবিস্ময় হয়ে থাকবে। তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তার সংগ্রামী চেতনা ও চিন্তাধারা এবং তার অনুসরণীয় কাজের দৃষ্টান্ত আমাদের অমূল্য সম্পদ। আজকের এ স্মরণ সভায় তার এ অমূল্য অবদান ও অমর আত্মবলিদান গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে।

১০ নভেম্বর ১৯৮৩ স্মরণে স্মরণসভা স্মরণ করছে সেই পাশবিক আক্রমণে মহান নেতা এম এন লারমার সাথে যারা যারা শহীদ হয়েছেন তাদেরকেও। এছাড়া আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রামে নানাভাবে অংশগ্রহণ করার কারণে পার্টির অনেক সংগ্রামী ব্যক্তিবর্গ কারাগারে অন্তরীণ হয়ে অগণিত দুঃখ কষ্ট ভোগ করে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন। অসংখ্য নারী ও শিশু নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। তাদের এ অমূল্য আত্মত্যাগ আজকের এ স্মরণ সভা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছে। মহান অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ১০ নভেম্বর ১৯৮৩ স্মরণে স্মরণসভা এক মিনিট দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন করার অনুরোধ করছি।

বক্তব্য: চঞ্চনা চাকমা
স্টাফ সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের অগ্রদূত মহান নেতা এম এন লারমা ৩৭ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে সংগ্রামী শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, আজ ১০ নভেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জন্য একটি কালো দিন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের উপরে নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে এবং অধিকারের জন্য জুম্ম জনগণের কাছে জাতির পথপ্রদর্শক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি সংবিধানে পাহাড় ও সমতলের আদিবাসীদের, খেটে খাওয়া মানুষ, শ্রমজীবী মানুষের কথা অনুর্ভুক্ত করার জন্য দাবি জানিয়েছিলেন। তার সে দাবি মানলে আজ এ অবস্থা হত না। আজকে আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে যে দমন-পীড়ন, নির্যাতন-নিপীড়নের মাত্রা সেটা সমতল থেকে বুঝা যাবে না। আজ জুম্মরা যারা অধিকারের জন্য আন্দোলোন করছে সরকার ও রাষ্ট্র তাদেরকে উল্টো সন্ত্রাসী তকমা দিয়ে জেল-জুলুম করছে, কিন্তু আসল সন্ত্রাসীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। দমন-পীড়ন অব্যাহত রেখেছে। তাই লারমার চেতনাকে ধারণ করে জুম্ম জনগণ ও আদিবাসীদের অধিকার আদায়ের জন্য কাজ করে যেতে হবে।

বক্তব্য: রাজেকুজ্জামান রতন
বাসদ নেতা

এম এন লারমা একজন আদিবাসী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তিনি কেবল দেশের পাহাড়ের মানুষের প্রতি বৈষম্য দেখেননি, তিনি সমতলের মানুষের বঞ্চনার কথাও দেখেছিলেন। স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে সাম্য, সামাজিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও, স্বাধীনতার পর যত দিন গড়িয়েছে সাম্যের পরিবর্তে বৈষম্য, সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তে অপমান এবং ন্যায় বিচারের পরিবর্তে নিপীড়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের সংবিধান প্রণয়নের সময় সে সংবিধান কতখানি গণতান্ত্রিক তা এম এন লারমা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তিনি আদিবাসী মানুষের অধিকারের কথা, নারী-কৃষকের কথা সংসদে উত্থাপন করেছিলেন। যে সংকটের কথা তিনি বলেছিলেন সেটা যদি কাটানো যেত বাংলাদেশ কান্নার দেশে পরিণত হত না, উগ্র ধর্মীয় উন্মাদনার দেশে পরিণত হতো না।

তিনি সেসময় যে প্রশ্নগুলো তুলেছিলেন আজো আমাদের সে প্রশ্নগুলো তুলতে হবে। আজ এম এন লারমা নাই কিন্তু তার প্রশ্নগুলো আছে। আজ এম এন লারমা নাই কিন্তু মানুষের দুঃখগুলো আছে। আজ এম এন লারমা নাই কিন্তু মানুষের যন্ত্রণা আছে। ফলে মানুষের মাঝে বঞ্চনা, যন্ত্রণা যত থাকবে অতদিন এম এন লারমা বেঁচে থাকবেন। তিনি কেবল আদিবাসীদের নেতা নন, তিনি সর্বহারা মানুষেরও নেতা।

বক্তব্য: মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম
সভাপতি, সিপিবি

১০ নভেম্বরের কর্মসূচিতে এলে আমার একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের কথা মনে পড়ে যায়। শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা মনে পড়ে যায়। আমরা জাতিগত শোষণ, শ্রেণিগত শোষণের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বৈষম্যহীন যে দেশ গঠনের স্বপ্ন দেখছিলাম, কিন্তু স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধের যে স্বপ্ন ছিল তা বাস্তবায়িত হয়নি বরং সবকিছু কেড়ে নেয়া হয়েছে। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের কাছে বারবার ফিরে আসা আমাদের এখন আশু কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ শোষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল, এ আদর্শটা কখনো বিভাজিত হতে পারে না। এ সংগ্রাম কোন জাতিগত সুবিধা আদায়ের জন্য নয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যেমনি করে বাঙালিদের থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে, ঠিক তেমনি গত ৪৮ বছর যাবত বাঙালি ছাড়াও অন্যান্য আদিবাসীদের তাদের জাতীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ একটি বহুজাতির দেশ। সংখ্যার দিক দিয়ে অন্যে জাতির অধিকার হরণ করা যায় না। ক্ষমতাসীনরা বলে থাকে আমরা আদিবাসীদের বেশি অধিকার দিয়েছি। কিন্তু আমি প্রশ্ন রাখতে চাই, আদিবাসীরা আমাদের দিয়েছে না আমরা আদিবাসীদের দিয়েছি? আদিবাসীদের সংগ্রাম, জুম্ম জনগণের সংগ্রাম বাংলাদেশে ১৭ কোটি মানুষের সংগ্রামের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই জাতিগত নিপীড়ন ও মুক্তির প্রশ্নে আমাদেরকে লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

বক্তব্য: রবীন্দ্রনাথ সরেন
সভাপতি, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ

আজকে বাংলাদেশের আদিবাসীরা যে অবস্থায় উপনীত হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সরকার বলছে, দেশ দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা দেখছি, আদিবাসীদের অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। কারণ আদিবাসীদের মৌলিক অধিকার প্রতিনিয়ত খর্ব হচ্ছে। এম এন লারমা যে স্বপ্ন নিয়ে লড়াই শুরু করেছিলেন আজ তার সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে না। আমরা সারা বাংলাদেশে শুনি, আদবাসীদের উপর নিপীড়ন, ভূমি দখল, নারী ধর্ষণ, হত্যা, ভূমি থেকে উচ্ছেদ ইত্যাদি চলমান রয়েছে। আদিবাসীদের যে লড়াই সংগ্রাম সেটাকে অব্যাহত রাখতে হবে। এম এন লারমার দিকদর্শনকে অনুসরণ করতে হবে, লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

বক্তব্য: সঞ্জীব দ্রং
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম

আমরা একটা কঠিন সময় পার করছি, বিশেষ করে আদিবাসী মানুষ, প্রান্তিক মানুষ, চা বাগানের মানুষ, শ্রমজীবী মানুষ, কৃষক মানুষ, খেতে খাওয়া মানুষ। যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল তা থেকে বহুদূরে এ রাষ্ট্র চলে গেছে। এম এন লারমা স্বপ্ন দেখেছিলেন, একটি শোষণহীন, বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের। যে রাষ্ট্রে এ দেশের সকল নাগরিক তার জাতিগত পরিচয়, সাংস্কৃতিক পরিচয়, ধর্মীয় পরিচয়, ভাষাগত পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকবে। কিন্তু স্বাধীনতার প্রায় ৫০ বছর হতে চললেও আমরা সে স্বপ্ন থেকে দূরে চলে

গেছি। বাংলাদেশের সংবিধান যখন প্রণীত হয়েছিল তখন তিনি স্বাক্ষর করেননি। তিনি সে সংবিধানকে ধনিক শ্রেণির সংবিধান বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। তিনি সংবিধান পরিবর্তন করে সবার জন্য সংবিধান রচনার দাবি তুলেছিলেন। আদিবাসী মানুষের দাবি কোন অলীক দাবি নয়। এ দাবি খেতে খাওয়া মানুষের সাথে বেঁচে থাকার দাবি। তাই আবারো শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, আদিবাসী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একসাথে লড়াইয়ের আহবান জানাই।

বক্তব্য: সাংবাদিক আবু সাঈদ খান

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ১৯৭৩ সালে যেটি বুঝেছিলেন সেটা আমাদের বুঝতে অনেক সময় লেগেছিল। উনি গণপরিষদের অধিবেশনে বলেছিলেন, আমাকে বাঙালি বানাবেন না। আমার বাবা-মা চৌদ্দ গোষ্ঠী কেউই বাঙালি না। তবে মিলেমিশে বাঙালিদের সাথে বাস করছি। অতএব বাঙালি, চাকমা, মারমা আমরা সবাই মিলে বাংলাদেশী। নাগরিক পরিচয় হওয়া উচিত বাংলাদেশি। তিনি নারীর অধিকারের কথা, ভেদাভেদ ভুলে সম্প্রীতির বাংলাদেশের কথা বলেছিলেন। এসব কিছুই তিনি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সে সুযোগ না দেয়াতে সবকিছুই অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সমাধানের পথ খুঁজে নিতে বাধ্য হয়। সেই আন্দোলনের মধ্যে সমাধানের উপায় হিসেবে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সেটাও এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। আবার সমস্যাকে জিইয়ে রাখা হয়েছে। গণতান্ত্রিক পথ যখন রুদ্ধ হয়ে যায়, তখন অগণতান্ত্রিক পথের দিকে মানুষ ধাবিত হয়। তাই অতিসত্ত্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হবে।

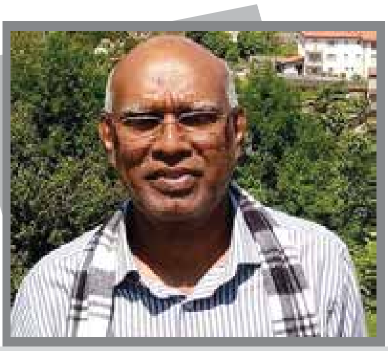

বক্তব্য: নোমান আহম্মেদ খান
মানবাধিকার কর্মী ও আইইডি'র নির্বাহী পরিচালক

এম এন লারমা একজন সংগ্রামী ও লড়াকু ছিলেন। তিনি যেখানে যে সুযোগ পেয়েছেন শিক্ষার আলো জ্বালিয়েছেন, গণতান্ত্রিকভাবে বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন, কৃষক, নারী, পতিতা, শ্রমিক, মেহনতি মানুষের মুক্তির জন্য লড়াই করেছেন, সংগ্রাম করেছেন। আমরা দেখেছি এ অঞ্চলের মানুষদের মুক্তির জন্য মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি অস্ত্র হাতে নিয়ে লড়াই করেছিলেন এবং তিনি মুক্তিযুদ্ধের পরে যে সংবিধান রচনা হয়েছিল সে সংবিধানের উপরে তিনি যে বক্তব্য রেখেছিলেন সে বক্তব্য আজো বিরল। তিনি একাই সবার জন্য অধিকারের দাবিতে যে বক্তব্য রেখেছিলেন আমি সে সময় কোন জাতীয় নেতৃবৃন্দকে তাঁর মত হতে দেখিনি।

আমি আজো বলতে পারি, তাঁকে যেভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করা হয় তা কোনভাবে সঠিক নয়। তিনি একজন জাতীয় নেতা। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, আজকের দিনে আমরা তাকে সাবেক সংসদ সদস্য হিসেবে বলতেও দ্বিধাবোধ করি। আজ আদিবাসীদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ পরিলক্ষিত। এ হতাশা ও ক্ষোভ জাতি ও সমাজের জন্য সুখকর নয়। কাউকে পিছনে ফেলে রেখে, বৈষম্য করে, ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র করা যাবে না।

বক্তব্য: শরীফ নুরুল আম্বিয়া
সভাপতি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল

তিনি জুম্ম জনগণের নেতা এবং বাংলাদেশের তথা মেহনতি মানুষেরও নেতা। এটা ঠিক যে, একটা বিভাজন রেখা এখানে

রয়েছে। ১৯৭৯ সালে তদানীন্তন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদের লক্ষ্য ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বায়ত্তশাসন দেয়া। সে জন্য আমরা উপেন্দ্র লাল চাকমাকে আমাদের প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করিয়েছি। পাহাড়ের নানা ধারায় আন্দোলনের ফলে একটি চুক্তি হয়েছে। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, এ জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোন বিকল্প রাস্তা নেই।

বক্তব্য: রাশেদ খান মেনন
সভাপতি, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা কেবল জুম্ম জনগণের নেতাই ছিলেন না, তিনি এদেশের মেহনতি শ্রমিক মানুষের নেতা। আমরা বাংলাদেশ নামক দেশটি প্রতিষ্ঠার আগে যে লড়াই করেছিলাম তা হল জাতিগত নিপীড়ন থেকে মুক্তির পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের শোষণ মুক্তি অর্জন করা। আন্দোলনের বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে ১৯৬৯ সালে যে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নিল, সেখানে জাতিগত নিপীড়ন থেকে মুক্তির পাশাপাশি জনগণের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের মুক্তির প্রশ্নটাও উঠেছিল। সেটা সাধারণ মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্র লাভের পর দেশ গঠনে সে বিষয়গুলো তেমন আমলে নেয়া হয়নি। সে কারণে সেদিন গণপরিষদে সবাইকে বাঙালি বানানোর চেষ্টা ঘটেছিল। কিন্তু তার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এম এন লারমা। তিনি জাতিগতভাবে চাকমা হিসেবে পরিচয় এবং জাতীয়তা বাংলাদেশি হিসেবে পরিচয় দিতে দাবি জানিয়েছিলেন। আবার সেই বাংলাদেশি পরিচয় জিয়াউর রহমান দিলেও সেখানেও জুম্ম জনগণের পরিচয় স্বীকৃত হয়নি। বরং নিপীড়নের মাত্রাতা আরও বেড়েছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের জন্য একটি জাতীয় কমিটির সদস্য হিসেবে আমার পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। বনের গহীন অরণ্যে গিয়ে শান্তিবাহিনীর সাথে আলাপ করার সে বিরল সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমি যখন একজন লোককে নিজের বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করেছিলাম ততবারই তিনি বাংলাদেশ বলে উত্তর দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ বলার মাধ্যমে দেশের উপর তার অধিকার করায়ত্ব বুঝিয়েছিলেন।

জাতিসংঘ ঘোষিত আদিবাসী বর্ষ ১৯৯২ সালে শেখ হাসিনা এবং খালেয়া জিয়া উভয়েই আদিবাসী হিসেবে বাণীও দিয়েছিলেন এবং তাদের অধিকারকে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু পঞ্চদশ সংশোধনীতে যখন আমরা প্রস্তাব দিয়ে এলাম আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়ে এত বছর যাবত চলমান সমস্যাকে সমাধান করুন। কিন্তু আমার এখনো মনে আছে, তারা গুগল সার্চ করে আইএলও এর আদিবাসী সংজ্ঞা তারা একটার পর একটা আমাদের সামনে হাজির করল। আমরা বলেছিলাম দেশ গঠনের শুরুতে যে ভুলটা করেছিলাম আদিবাসী স্বীকৃতি দিয়ে সে ভুলটা শোধরানো উচিত। কিন্তু তা আর হয়ে উঠেনি। এম এন লারমার সে স্বপ্ন পূরণের জন্য পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। আসুন, দেশের মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করি।

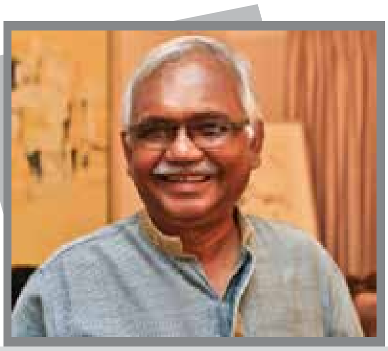

বক্তব্য: ডাক্তার মুস্তাক হোসেন
আহ্বায়ক, জাতীয় কমিটি

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জীবনী ও চিন্তা যদি দেখি, তাঁর সংসদীয় ভাষণ যদি দেখি তাহলে বুঝতে পারব তিনি বিশাল একটা স্বচ্ছতার আলোকে দেশকে এবং দেশের জনগণকে অধিকার দেয়ার চিন্তা ভাবনা করেছেন। আমরা যেমনি করে ফিলিস্তিনে ইসরাইলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কথা বলি, চীনের উইঘুরে মুসলিম নির্যাতনের কথা বলি, কাশ্মীরে আগ্রাসনের কথা বলি, ঠিক তেমনিভাবে বাঙালি তরুণ প্রজন্মকে পাহাড়ের আদিবাসীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে।

আলোচনা সভা শেষে মোমবাতি প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে এফ মাইনর, কফিল উদ্দিন, মাদলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনা করা হয়।

প্রবন্ধ

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন

মঙ্গল কুমার চাকমা

যুগে যুগে নিপীড়িত, নির্যাতিত ও শোষিত মানুষ স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিপীড়ক ও শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছে। আজও দিকে দিকে সেই সংগ্রাম নিববচ্ছিন্নভাবে চলছে। নিপীড়ন, নির্যাতন, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও শোষণের এক জলন্ত প্রমাণ ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জাতির আবাসভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের হাতে পদানত হওয়ার পূর্বে স্বাধীন রাজার শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামে ছিল মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও শোষণ। সমাজে অভিজাত ও প্রজা শ্রেণিই ছিল সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি। অভিজাত শ্রেণিই হলো শাসক আর এই অভিজাত সম্প্রদায় শাসনের নামে প্রজা শ্রেণির উপর চালাতো অকথ্য নির্যাতন ও নিপীড়ন। অন্যদিকে প্রজা শ্রেণি ছিল উৎপাদনে নিয়োজিত। তাদের না ছিল রাজনৈতিক অধিকার, না ছিল অর্থনৈতিক অধিকার। এরপরে শুরু হলো সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের নিপীড়ন, শোষণ ও বঞ্চনার ইতিহাস। সমগ্র ভারতবর্ষ দখলের এক পর্যায়ে প্রায় এক দশকব্যাপী যুদ্ধের পর ব্রিটিশরা পার্বত্য চট্টগ্রাম দখল করে নেয়।

ব্রিটিশ শাসনামলে জাতীয় উন্মেষ না হওয়ার প্রধান প্রতিবন্ধকতা ছিল সামন্তবাদী ও উপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা। প্রশাসনিক কাঠামো আর অর্থনৈতিক কাঠামো উভয়ই সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হতো। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের হাতে পদানত হলে ব্রিটিশ সরকার তার সাম্রাজ্য রক্ষার্থে ও শোষণ অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে পরাজিত অভিজাত শ্রেণিকে হাতে রেখেই পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন নীতি নির্ধারণ করেছিল। ব্রিটিশ শাসনের পরাধীনতার নাগপাশ থেকে পরিত্রাণ লাভের আশায় জুম্ম জনগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে এবং জুম্ম জনগণের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণে উদ্যোগ নিতে থাকে। নিজস্ব রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করতে থাকে। তারই আলোকে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে পার্বত্য অঞ্চলে নানা সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা হতে থাকে।

১৯১৫ সালের (পার্বত্য চট্টগ্রাম) চাকমা যুব সমিতি থেকে ১৯২০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতি ও ১৯২৮ সালের চাকমা যুবক সংঘ গড়ে উঠেছিল জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজের সমাজ সচেতনতা ও দেশ সেবার মনোবৃত্তি থেকে। এভাবেই জুম্ম সমাজে জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু হয়েছিল এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম যুব সমাজই সর্বপ্রথম স্বৈরাচারী সামন্ত নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেছিল। এক সময় চিত্ত কিশোর চাকমা, মোহন লাল চাকমা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ স্বদেশী আন্দোলনের যুক্ত ছিলেন। চিত্ত কিশোর চাকমা মাস্টারদা সূর্য সেনদের অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দল ইত্যাদি বিপ্লবী দলের সাথেও যুক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। ১৯৩৯ সালেই চাকমা রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় শরৎচন্দ্র তালুকদার ও সুনীতি জীবন চাকমার নেতৃত্বে গড়ে উঠে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র সমিতি'। ১৯৩৯ সালে যামিনীরঞ্জন দেওয়ান ও স্নেহ কুমার চাকমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতি পুনরুজ্জীবিত করা হয় এবং এই সংগঠনের মাধ্যমে রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু হয়। এভাবে ব্রিটিশ শাসনামলের শেষের দিকে এবং ১৯শতকে এসে আধুনিক রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটতে থাকে পার্বত্য চট্টগ্রামে।

জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজের মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ

জুম্ম সমাজের জাতীয় চেতনা উন্মেষ না হওয়াই পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন রাজনৈতিক সংস্থা গড়ে উঠতে পারেনি। ঘুঁণেধরা সামন্ত নেতৃত্ব কোন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেনি। গড়ে তোলারও তার কোন ভিত্তি ছিল না। আধুনিক সভ্যতা সমাজে পরিব্যাপ্ত হলেও জাতীয়তাবাদের ভিত্তি গড়ে উঠেনি। যেটুকু জাতীয় চেতনার উন্মেষ সাধিত হয় তাও সুসংহত অবস্থায় না থাকার কারণে ভারতবর্ষ বিভক্তিকরণ সময়কালীন ও তৎপরে পাকিস্তান সরকার জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র অবাধে কার্যকর করতে থাকে। সামন্তবাদী জাতীয় নেতৃত্ব যেহেতু প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী ও আপোষপন্থী ছিল সেহেতু জুম্ম জনগণের অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এগিয়ে আসেনি। ফলে বরাবরই এই সামন্ত নেতৃত্ব তার তোষণনীতি, ভীরু ও প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র নিয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। ব্রিটিশ শাসনামলে জাতীয় চেতনাবোধ উন্মেষ হতে না পারায় কোনও

রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠতে পারেনি। ফলে জুম্ম জাতির স্বার্থ সংরক্ষণে ব্রিটিশ সরকার কোন সুব্যবস্থা তো করে দেয়ইনি, বরং কোন এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে জড়িত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়ে জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথ উন্মুক্ত করে দিয়ে যায়।

> এম এন লারমার সবচেয়ে বড় অবদান হলো– রাজনৈতিকভাবে অসচেতন ও অনেকটা নিদ্রামগ্ন জুম্ম জাতিকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় জাগরিত করে রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সব কিছুরই যেমন পরিবর্তন ও অগ্রগতি রয়েছে, তেমনি জুম্ম জনগণের সমাজ ব্যবস্থাও এক জায়গা অনড় ও অটল হয়ে থাকেনি। ১৯০০ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক পরিবেশের তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ও অগ্রগতি না হলেও ধীরে ধীরে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার আভিজাত্যবোধের সাথে উদীয়মান জাতীয় চেতনাবোধের সংঘাত বাঁধতে থাকে। আধুনিক সভ্যতা ও শাসনব্যবস্থার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা প্রত্যক্ষ করার মতো জাতীয় চেতনার উন্মেষ ধীরে ধীরে জুম্ম জনগণের মধ্যে, বিশেষত শিক্ষিত ছাত্র-যুব সমাজের মধ্যে বিকাশ হতে থাকে।

১৯১৫ সালে রাজমোহন দেওয়ানের নেতৃত্বে গঠিত চাকমা যুবক সমিতি, ১৯২৮ সালে ঘনশ্যাম দেওয়ানের নেতৃত্বে গঠিত চাকমা যুবক সংঘ, কৃষ্ণকিশোর চাকমার উদ্যোগে শিক্ষা আন্দোলন জুম্ম জাতীয় জাগরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

বস্তুত জনগণের জাতীয় ক্রান্তিলগ্নে জুম্ম ছাত্র সমাজ নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকেনি। উগ্র ধর্মান্ধ ও স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকারের হীন কার্যক্রম খুবই গভীরভাবে নিরীক্ষণ করতে থাকে। জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব বিলুপ্তির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কিভাবে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায় তার উপায় খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। একদিকে ব্রিটিশ প্রদত্ত অগণতান্ত্রিক উপনিবেশ ও সামন্ততান্ত্রিক ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনবিধি, অপরদিকে পাকিস্তান সরকারের জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্তিকরণের হীন ষড়যন্ত্র– জুম্ম জনগণের জাতীয় জীবনে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ইন্দো-চীনের মুক্তি সংগ্রাম নব্য শিক্ষিত ও জুম্ম ছাত্র সমাজের মধ্যে প্রবলভাবে রেখাপাত করে। সর্বোপরি বিশ দশকের মাঝামাঝি থেকে চল্লিশ দশক পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ও সমাজে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে সংগ্রাম অব্যাহত ছিল তা থেকে পঞ্চাশ দশকের জুম্ম ছাত্র সমাজ যথেষ্টই অনুপ্রেরণা লাভ করে। সুতরাং যখন পঞ্চাশ দশকের প্রারম্ভ থেকেই বেআইনী বাঙালি মুসলিম অনুপ্রবেশকরণ ও সুকৌশলে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি পাকিস্তান সরকার স্বীয় স্বার্থে ব্যবহার করতে থাকে তখন আর সচেতন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকামী ছাত্র সমাজ চুপ করে থাকতে পারেনি। এম এন লারমা ১৯৬০ সাল থেকে নিতে থাকেন সচেতন ও অধিকারকামী জুম্ম ছাত্র সমাজকে সংগঠিত করার জোরালো উদ্যোগ। এভাবে জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রাম নতুনরূপে জন্মলাভ করে। শুরু হলো জাতীয় উন্মেষ সাধনের অব্যাহত প্রচেষ্টা।

এম এন লারমার নেতৃত্বে সংগ্রামের আহ্বান

পৃথিবী জুড়ে যখন নিপীড়িত, নির্যাতিত ও শোষিত মানুষ অত্যাচার ও শোষণের নাগপাশ ছিন্ন করে মুক্ত হওয়ার জন্য দুর্বার গতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছিল, তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের সচেতন সমাজ নিজেদেরকে অদৃষ্টের উপর ঠেলে দিয়ে পাকিস্তান সরকারের সর্বপ্রকারের নির্যাতন, নিপীড়ন ও শোষণ কিভাবে সহ্য করবে? তাই জুম্ম জাতির এহেন করুণ অবস্থা সম্যকভাবে উপলব্ধি করে তরুণ ছাত্রনেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাই ষাট দশকের গোড়াতেই প্রথম এগিয়ে এলেন এই নিদ্রামগ্ন জুম্ম জাতিকে নিদ্রাভঙ্গের শপথ নিয়ে।

১৯৫৬ সাল থেকে ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। ১৯৫৭ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম পাহাড়ি ছাত্র সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৯৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের যোগদানের মাধ্যমে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি অধিকার-হারা জুম্ম জনগণের মর্মবেদনা অনুভব করতে পেরেছিলেন। প্রজা শ্রেণির উপর অভিজাত শ্রেণির শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে ছোটকাল থেকেই তিনি ছিলেন প্রতিবাদী। তিনি ছাত্র জীবন থেকেই স্বীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন। ছাত্র জীবনে কেউ যদি স্বজাতির নামে কোন অসম্মানসূচক ও অবজ্ঞাসূচক

কথা বললে তিনি সাথে সাথে তার জোরালো প্রতিবাদ না করে থাকতেন না। রাঙ্গামাটি উচ্চ বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সময় তিনি ভেতরে ভেতরে নানা রাজনীতি ও দর্শনতত্ত্বের বই পড়তেন। সহপাঠি বন্ধুদের বুঝাতে চেষ্টা করতেন যে, 'এই ডিগ্রীর সার্টিফিকেট দিয়ে আমাদের কোন লাভ হবে না। সরকারি চাকরি করি আর বেসরকারি চাকরি করি, আমাদের জুম্ম জাতির ভাগ্য কিছুতেই পরিবর্তন হবে না। কাজেই আমাদের অন্য পথ ধরতে হবে। যেই পথে কিন্তু বড়ই কঠিন আর বিপদ সংকুল। যেমন– মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষ বোস, সূর্য সেন-এর মতো অনেক মহাপুরুষ ও বিপ্লবীদের ঘটনাবলী ইতহাসে লিপিবদ্ধ আছে।' এভাবেই তিনি ছাত্র জীবনে সহপাঠি ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস চালাতেন।

এম এন লারমার সবচেয়ে বড় অবদান হলো– রাজনৈতিকভাবে অসচেতন ও অনেকটা নিদ্রামগ্ন জুম্ম জাতিকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় জাগরিত করে রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জনগণ একের পর এক বিজাতীয় শাসকগোষ্ঠীর নির্মম ও বর্বরোচিত দমন-পীড়নে জর্জরিত হয়ে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব যখন চরম অবলুপ্তির পথে ধাবিত হচ্ছিল ঠিক তখনি মুক্তির অগ্নিমন্ত্র নিয়ে জুম্ম জাতীয় জীবনে আবির্ভূত হন অসাধারণ প্রতিভাধর তরুণ ছাত্রনেতা এম এন লারমা।

১৯৬০ সাল থেকে এম এন লারমার নেতৃত্বে পাহাড়ি ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে একটা রাজনৈতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৬২ সালে চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালীর থানার কানুনগো পাড়ার স্যার আশুতোষ কলেজে সর্বপ্রথম পাহাড়ি ছাত্রদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত করার পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু নানা কারণে উক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। পরে ১৯৬২ সালের ১৩ নভেম্বর চট্টগ্রাম বান্ডেল রোডস্থ পাহাড়ি ছাত্রাবাস 'বিন্দু নিলয়'-এ পাহাড়ি ছাত্রদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে চট্টগ্রাম, ঢাকা ও কুমিল্লায় অধ্যয়নরত ২০-২৫ জন ছাত্র যোগদান করেন বলে জানা যায়। উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের মধ্যে চট্টগ্রাম থেকে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও সুবেশ কুমার চাকমা, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ডিগ্রীতে অধ্যয়নরত জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, ঢাকা থেকে অমরেন্দ্র চাকমা প্রমুখ ছাত্ররা ছিলেন অন্যতম। মূলত পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক পরিস্থিতি ও জুম্ম জনগণের অধিকার বিষয়ে এই আলোচনা করা হয় বলে সন্তু লারমা লেখকের সাথে এক সাক্ষাৎকারে জানান। এই সম্মেলনে এম এন লারমা জুম্ম ছাত্র সমাজকে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে জুম্ম সমাজের শিক্ষা বিস্তারসহ জাতীয় জাগরণের সূত্রপাত করার আহ্বান জানান। সম্মেলনে শ্লোগান উঠে– গ্রামে ফিরে যাও, জুম্ম জনতাকে অধিকার সচেতন করে তোলো, ঘুঁণেধরা প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত নেতৃত্বের উপর আঘাত হানো। এভাবেই এম এন লারমার ডাকে শুরু হলো নতুন পদযাত্রা। এম এন লারমার এই আহ্বান জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী ভূমিকা পালন করে থাকে।

তবে এ সম্মেলন অনুষ্ঠানে চাকরিজীবী জুম্ম বাবু ও অভিভাবকদের পক্ষ থেকে বিরোধিতা ছিল। তখনকার সময়ে রাজনীতি ছিল নিষিদ্ধ। রাজনীতির সাথে যুক্ত ছাত্রদের উপর গোয়েন্দাদের ছিল কড়া নজরদারি। রাজনীতির সাথে যুক্ত রয়েছে এমন তথ্য সরকারের নিকট গেলে সেসব ছাত্রদের উপর লাল কালি দাগ পড়তো। ফলে অভিভাবক চাইতেন না, ছেলেপেলেরা সরকারের কুনজরে পড়ে তাদের ভবিষ্যত জীবনের ক্ষতি হোক। কিন্তু এসব বিরোধিতা উপেক্ষা করে প্রবল সাহস ও প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে সেদিন জুম্ম ছাত্ররা ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও সেই সম্মেলন সম্পন্ন করেছিল।

কাপ্তাই বাঁধের বিরুদ্ধে এম এন লারমার প্রতিবাদ ও অতঃপর গ্রেফতার

এম এন লারমা ১৯৬০ সালে জুম্ম জনগণের বুকের উপর নির্মিত কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এবং স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকারের ষড়যন্ত্রের হীন মুখোশ উন্মোচন করে ১৯৬২ সালের আগস্টে এক বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে কাপ্তাই বাঁধের ফলে জুম্ম জনগণের ৫৪ হাজার একর জমি হ্রদের পানিতে তলিয়ে যাওয়া, লক্ষাধিক লোকের উদ্বাস্তু ও ভিটেমাটি হারানো, উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আর পুনর্বাসন না দেয়া ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছিল। উন্মোচন করে তুলে ধরা হয়েছিল জুম্ম জনগণের উপর পাকিস্তান সরকারের অন্যায়-অবিচার, ভণ্ডামী ও জোচ্চুরীর হীন মুখোশ। বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছিল উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আর পুনর্বাসনের।

বিবৃতিটি প্রথমে একবার চট্টগ্রামে ছাপানো হয়েছিল। কিন্তু বিবৃতির ভাষা অত্যন্ত কড়া হয়েছে মর্মে জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা ও প্রদ্যোৎ দেওয়ান যুক্তি তুলে ধরে আপত্তি করলে কিছু শব্দের যৎসামান্য পরিবর্তন করে বিবৃতিটি আরেকবার ছাপানো হয়। এরপর রাঙ্গামাটিতে নিয়ে এসে বিলি করার দায়িত্ব পালন করেন তৎকালীন ছাত্র কালি মাধব চাকমা ও সুবেশ কুমার চাকমা। সুবেশ কুমার চাকমা তখন কানুনগো পাড়ার স্যার আশুতোষ কলেজে পড়তেন। পরিকল্পনা মোতাবেক একদিন সকালে দু'জনে দু'টি সাইকেল যোগে তাঁরা কানুনগো পাড়াস্থ শ্রীপুর ছাত্রাবাস থেকে বিবৃতিগুলো নিয়ে রওয়ানা দেন চন্দ্রঘোনার উদ্দেশ্যে। সেখানে পৌঁছে এম এন লারমার ব্যক্তিগত চিঠিসহ চন্দ্রঘোনা কাগজের মিলে তৎসময়ে চাকরিরত জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা ও ধর্মদর্শী চাকমার কাছে

খামে ভর্তি বিবৃতি বিলি করেন তাঁরা। এরপর পৌঁছলেন কাপ্তাই। সেখানে তৎকালীন সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) প্রভাত কুমার চাকমার নামে খামটি তাঁর কাছে পৌঁছে দেন। খামটি খুলে বিবৃতি পড়ার পর তিনি বিবৃতিগুলো বিলি না করার পরামর্শ দেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, মঞ্জু (এম এন লারমা) ছাত্রদের শেষ করবে। এই বিবৃতি প্রকাশের বিষয়টি পাকিস্তান সরকারের কানেও গেছে বলে তিনি জানান। সরকার কাউকে ছাড়বে না। তাদেরও চাকরি থাকবে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। এরপর সুবেশ কুমার চাকমা ও কালিমাধব চাকমা রাঙ্গামাটিতে পৌঁছেন। বিবৃতিগুলো দেখলে কেউ তাদেরকে থাকার জায়গা দেবে না এটা ভেবে তাঁরা রাঙ্গামাটিতে কারো বাড়িতে না উঠে সরাসরি তবলছড়ির আনন্দ বিহারে উঠেন। এরপর বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী গৌতম মুনি চাকমার সাথে দেখা হলে তিনি বিবৃতিসহ সুবেশ কুমার চাকমা ও কালিমাধব চাকমাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে যান ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। তারপর খামে ভরে পাহাড়ি ছাত্র সমিতির সহযোগিতায় তাঁরা রাতের বেলায় চুপিসারে বাড়ি বাড়ি বিবৃতিগুলো বিলি করেন।

এরপর সুবেশ কুমার চাকমা চট্টগ্রামে ফিরে তিনি এম এন লারমার কাছে যথারীতি রিপোর্ট প্রদান করেন। এ সময় তাঁরা পূর্ণাঙ্গ বরণ চাকমা নামে একজন ছাত্রের বিছানায় একজন দাঁড়িওয়ালা লোককে কথা বলতে দেখেছিলেন। তখনই এম এন লারমার সন্দেহ হয় তাঁকে সরকার আটক করতে পারে। দাঁড়িওয়ালা সেই লোকটি ছিল আসলে একজন গোয়েন্দা। শ্রীপুর ছাত্রাবাসেও তল্লাসী চালাতে পারে এই আশঙ্কায় সেখানে আপত্তিমূলক কোন লেখা বা কাগজপত্র থাকলে তা পুড়িয়ে ফেলার জন্য সেদিন সুবেশ কুমার চাকমাকে এম এন লারমা নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেসময় পাহাড়ি ছাত্র সমিতির প্রধান কার্যালয় ছিল শ্রীপুর ছাত্রাবাসে। তিনি সেদিন সুবেশ কুমার চাকমাকে বলেছিলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে একদিন আন্দোলনের জোয়ার আসবে। পাকিস্তান সরকার তাঁকে গ্রেফতার করলেও যাতে ছাত্র সমাজ ঘাবড়িয়ে না যায় এবং পাহাড়ি ছাত্র সমিতিকে ধরে রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে তিনি সুবেশ কুমার চাকমাকে অনুরোধ করেছিলেন। সুবেশ কুমার চাকমা সেদিন সাড়ে ৬টার ট্রেনে চট্টগ্রাম শহর থেকে কানুনগো পাড়াস্থ শ্রীপুর ছাত্রাবাসে ফেরেন। এর কিছুদিন যেতে না যেতেই এম এন লারমাকে কাপ্তাই বাঁধের বিরুদ্ধে বিবৃতি প্রকাশের অভিযোগে তথা রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করে।

এম এন লারমা যে সাহস ও চেতনা নিয়ে সকল গতানুগতিক প্রাচীরকে ভেঙ্গে প্রতিবাদ করতে এলেন সেখানে জুম্ম জনগণের সামন্ত ও তথাকথিত অভিজাত নেতৃত্ব প্রকারান্তরে চরমভাবে বিরোধিতা করেছিলেন। ফলশ্রুতিতে জুম্ম ছাত্র সমাজের কয়েকজন সুবিধাবাদী ছাত্র বিশ্বাসঘাতকতা করে এম এন লারমাকে পাকিস্তান সরকারের কাছে ধরিয়ে দেয়। ফলে পাকিস্তান সরকার এম এন লারমাকে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত করে ১৯৬৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি নিরাপত্তা আইনের অধীনে গ্রেপ্তার করে। এম এন লারমা গ্রেফতার হলে তাঁকে মুক্তির জন্য জুম্মদের মধ্যে কেউ এগিয়ে আসেনি। মুক্তির জন্য কেউ মুখও খুলেননি। কিন্তু তৎসময়ে অনেক প্রগতিশীল বাঙালি রাজনীতিক ও আইনজীবী, যারা এম এন লারমার দেশপ্রেম, জাতি প্রেম ও মানবপ্রেমের কথা জানতেন, তারাই সর্বপ্রথম এগিয়ে আসলেন এম এন লারমার মুক্তির জন্য। তাদের মধ্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও চট্টগ্রাম শ্রম আদালতের অন্যতম আইনজীবী এ্যাডভোকেট লুৎফুল হক মজুমদার এম এন লারমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের আইনী লড়াই চালান। এ সময় চট্টগ্রাম ভিক্টোরিয়া কলেজে অধ্যয়নরত জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা চট্টগ্রাম আদালতে এসে এ্যাডভোকেট লুৎফুল হক মজুমদারের সাথে এম এন লারমার বিরুদ্ধ রুজুকৃত মামলার শুনানীতে অংশগ্রহণ করতেন।

জেল জীবনেও এম এন লারমা ছিলেন খুবই শৃঙ্খলা পরায়ণ। সকলের সাথে খুবই ভদ্র ও নম্র আচরণ করতেন। তাই জেলের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং হাজতী-কয়েদী সকলেই এম এন লারমাকে খুবই স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন। জে বি লারমার ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, এম এন লারমাকে গ্রেফতারের সময় কাপ্তাই বাঁধের উপর লেখা তার একটি প্রবন্ধ ধরা পড়ে। সেই প্রবন্ধকে দালিলিক প্রমাণ হিসেবে এম এন লারমার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র বিরোধী তৎপরতার অভিযোগ এনেছিল পাকিস্তান সরকার। তবে আদালতে সরকার পক্ষ এম এন লারমার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র বিরোধী তৎপরতার উপযুক্ত প্রমাণ দেখাতে ব্যর্থ হয়। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ একপর্যায়ে খারিজ হয়ে যায় বলে জে বি লারমা জানান।

এ্যাডভোকেট লুৎফুল হক মজুমদারসহ সেসব বাঙালি হিতাকাঙ্ক্ষী দেশপ্রেমিক বিপ্লবী বন্ধুদের অকান্ত প্রচেষ্টায় প্রায় দুই বছর জেল খাটার পর ১৯৬৫ সালের ৮ মার্চ এম এন লারমা জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। সেই প্রগতিশীল বিপ্লবী বাঙালি বন্ধুরাই চট্টগ্রাম জে এম সেন হলে এক বিরাট সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করে এম এন লারমাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেছিলেন। জেলে অন্তরীণ অবস্থায় সমাজকল্যাণ বিভাগের অধীনে থেকে ১৯৬৫ সালে স্নাতক পাশ করেন। ১৯৬৮ সালে বিএড পাশ করেন ও ১৯৬৯ সালে এলএলবি পাশ করে একজন আইনজীবী হিসেবে তিনি চট্টগ্রাম বার এসোসিয়েশনে যোগদান করেন। সে সময় চারু বিকাশ চাকমা বাংলাদেশ সরকারের হাতে গ্রেপ্তার হলে ঐ মামলার আইনজীবী হিসেবে তিনি যথেষ্ট দক্ষতা ও মহানুভবতার পরিচয় দেন।

গণসংগঠন ও জাতীয় জাগরণের জোয়ার

ষাট দশকের প্রথম থেকে এম এন লারমা, জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, অনন্ত বিহারী খীসা, জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, বীরকুমার চাকমা, প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ সংঘবদ্ধ হয়ে ছাত্র-যুব সমাজকে সংগঠিত করার কাজে নেমে পড়েছিলেন। তখন থেকেই গোপনে গোপনে রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু হতে থাকে। সেসময় শাসনতান্ত্রিক বাধা-নিষেধের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকাশ্য রাজনীতি করার অধিকার ছিল না। তবুও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সচেতন বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র-যুব সমাজ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ উন্নয়নের কার্যকলাপের আড়ালে ব্যাপক জুম্ম জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদান করে অধিকার সচেতন করে তুলতে থাকে। বিশেষ করে ১৯৬২ সালে জুম্ম ছাত্র সম্মেলনে ‘গ্রামে চলো, জুম্ম সমাজে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দাও, জুম্মদেরকে সচেতন করে তুলো’ –এম এন লারমার এই কালজয়ী আহ্বানে ছাত্র-যুব সমাজ গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন এলাকায় স্কুল প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষকতায় নিয়োজিত হয়ে একাধারে শিক্ষকতা ও জুম্ম জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলার কাজ এগিয়ে নিতে থাকেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরণে, রাজনৈতিক সচেতনতা বিস্তারে, শিক্ষা প্রসারে এম এন লারমার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যিনি অসাধারণ ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি হলেন এম এন লারমার ছোট ভাই, যিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। গ্রামে গ্রামে গিয়ে জুম্ম জনগণের মধ্যে শিক্ষা আলো ছড়িয়ে দেয়া এবং রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে তোলার অংশ হিসেবে তিনিও ষাট দশকে শিক্ষকতার পেশায় নিযুক্ত হন।

ষাটদশকে পাহাড়ি ছাত্র সমিতির এককালের অনেক সক্রিয় সদস্য শিক্ষা সমাপন করে পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে দেশ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ হন। খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্কুল গড়ে তুলে অনেকে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হতে থাকেন এবং সেই সাথে স্ব স্ব এলাকায় রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকেন। অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় সদস্যরা শিক্ষকতায় নিযুক্ত থেকে একদিকে জুম্ম জনগণকে অধিকার সচেতন করে গড়ে তোলা, অন্যদিকে রাজা-হেডম্যান-কার্বারী এই তিনে গঠিত ঘুণেধরা আপোষমুখী জাতীয় নেতৃত্ব পরিবর্তনে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। সর্বোপরি স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকারের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জুম্ম জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে থাকে। তাদেরই নেতৃত্বে নতুন নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে লাগলো। শ্লোগান উঠলো– লেখাপড়া শিখতে হবে, শিক্ষা ছাড়া জুম্ম জাতির মুক্তি নেই। এভাবেই সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে এক নতুন জীবনের অধ্যায় সূচিত হলো।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে জুম্ম ছাত্র সমাজ একদিকে উগ্র ধর্মান্ধ পাকিস্তান সরকারের জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র আর অন্যদিকে অযোগ্য ও প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয় নেতৃত্বের দুর্বলতা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে থাকে। ১৯৬৫ সালে রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বপ্রথম একটি বেসরকারি কলেজ স্থাপিত হয়। এতে সমগ্র শিক্ষাঙ্গণ তথা জাতীয় জীবনে নবদিগন্তের সূত্রপাত ঘটে। এতে পাহাড়ি ছাত্র সমাজের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হয়। প্রমোদ বিকাশ কার্বারী জানান যে, ১৯৬৫ সালের (১৪ নভেম্বর বা ডিসেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় পাহাড়ি ছাত্র সমিতির নতুন কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটিতে প্রমোদ বিকাশ কার্বারীকে সভাপতি এবং মংসানু চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। পরের বছর ১৯৬৬ সালে পাহাড়ি ছাত্র সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঢাকা থেকে রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তর করা হয়। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে পাহাড়ি ছাত্র সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয় নতুন করে রাঙ্গামাটি কলেজ ভবনে উদ্বোধন করা হয়। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তৎসময়ে ছাত্র-যুব নেতা ও শিক্ষাবিদ জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জুম্ম ছাত্র সমাজকে দেশ গঠনের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

পাহাড়ি ছাত্র সমিতি ১৯৬৫ সাল থেকে সমিতির শাখা সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্প্রসারিত করতে থাকে। গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামে আপামর জুম্ম ছাত্র সমাজ ছড়িয়ে পড়লো। তারা জুম্ম জনগণের মধ্যে গিয়ে জাতীয় ইতিহাস ও জাতীয় নেতৃত্ব সম্পর্কে বক্তব্য দিতে লাগলো। জাতি হিসেবে বেঁচে থাকতে চাইলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া চাই আর ঐক্যবদ্ধ হয়ে সর্বপ্রকারের অত্যাচার অবিচার, শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যেতে হবে তবেই তো দেশ-জাতি হিসেবে টিকে থাকা সম্ভবপর। তখন সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ছয়দফা ও ১১ দফা আন্দোলনের জোয়ার। এই জোয়ারে পাহাড়ি ছাত্র সমিতির তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের সচেতন বুদ্ধিজীবী সমাজও সিক্ত না হয়ে থাকতে পারেনি।

১৯৭০ সালের ২০ জানুয়ারি পাহাড়ি ছাত্র সমিতির সম্মেলন রাঙ্গামাটি ইন্দ্রপুরী সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিক্রিয়াশীল সরকার এই সম্মেলন বানচাল করে দিতে উদ্যত হয়। কিন্তু সমাগত প্রতিনিধিরা স্বার্থকভাবে এই সম্মেলন সম্পন্ন করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসহ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে অধ্যয়নরত জুম্ম ছাত্র প্রতিনিধি এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে উপস্থিত থাকেন। জুম্ম জনগণের ন্যায্য অধিকারসহ জুম্ম ছাত্র সমাজের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা আদায়ের সংগ্রামী শপথ নিয়ে এই সম্মেলন সমাপ্ত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে স্নেহময়

চাকমা জুনু, সাধারণ সম্পাদক হিসেবে রূপায়ণ দেওয়ান, সহ সাধারণ সম্পাদক হিসেবে গৌতম কুমার চাকমা, সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে প্রশান্ত কুমার চাকমা, সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবে উষাতন তালুকদার নির্বাচিত হন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, পাহাড়ি ছাত্র সমিতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম শিক্ষক সমিতি সম্মিলিতভাবে জুম্ম সমাজ ও সংস্কৃতি উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে তোলার মাধ্যমে জাতীয় জাগরণ আনয়ন ও নেতৃত্ব গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে থাকে। জুম্ম জনগণ অধিকার সচেতন হয়ে উঠতে থাকে এবং যুগোপযোগী শাসন-ব্যবস্থা পাবার আশায় ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। জুম্ম জনগণ উপলব্ধি করতে থাকে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সংগ্রাম ছাড়া যেমনি ঘুঁণেধরা সামন্ত নেতৃত্বের পরিবর্তন করা যাবে না, তেমনি জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভবপর হবে না। এভাবেই ষাঠ দশকের শেষ প্রান্তে আর সত্তর দশকের প্রারম্ভেই জুম্ম জনগণের সচেতনতা ও ঐক্য শক্তি প্রত্যক্ষ করার মতো সুসংগঠিত হয়ে উঠে।

’৭০ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন

১৯৭০ সালের ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর তৎকালীন পাকিস্তানের যথাক্রমে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তরাঞ্চল আসন থেকে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন নেতৃত্বে জুম্ম তরুণ সমাজের দেশপ্রেমিক অংশকে নিয়ে গঠিত হয় ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম নির্বাচন পরিচালনা কমিটি’। চারু বিকাশ চাকমার বাড়ির উঠানে অনুষ্ঠিত এক সভায় এম এন লারমাকে আহ্বায়ক করে এই কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটির অন্যতম সদস্য সন্তু লারমা, অনিল বিহারী চাকমা (লংগদু চেয়ারম্যান), খাগড়াছড়ির জুরমরং থেকে যোগেশ চন্দ্র চাকমা, কালী মাধব চাকমা, এ্যাডভোকেট জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, প্রফেসর মংসানু চৌধুরী, উক্যজাই মারমা প্রমুখ। এই নির্বাচনী পরিচালনা কমিটি ১৬ দফা সম্বলিত নির্বাচনী ইসতেহার ঘোষণা করে। এই ইসতেহারে নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত স্বায়ত্তশাসনসহ শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও ভূমি অধিকারের দাবি উত্থাপন করা হয়। এ সময় রাঙ্গামাটি শহরের মাঝেরবস্তিতে ভূবনচন্দ্র চাকমার বাড়িটি ভাড়া নিয়ে নির্বাচনী পরিচালনা কমিটির অফিস খোলা হয়। এ অফিসে পাহাড়ি ছাত্র সমিতির কার্যক্রম চলতো। এই অফিসটি অনেকটা জুম্ম জনগণের ও পাহাড়ি ছাত্রদের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। অফিসের দাপ্তরিক দায়িত্বে থাকতেন অনাদি রঞ্জন চাকমা (অম্বর)।

সেসময় ছাত্র নেতা-কর্মীরাই পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের নির্বাচনী প্রচারনার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ছাত্র নেতা-কর্মীরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে শুভাকাঙ্ক্ষী ও সমর্থকদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে নির্বাচনী খরচ যুগিয়েছিলেন। ছাত্ররা নিজেরাই কেরোসিনের টিন কেটে পোস্টারের ব্লক তৈরি করে পুলতার দিয়ে পোস্টার ছাপাতেন। অনেক পোস্টার হাতেও লিখতেন। সেভাবেই এলাকায় এলাকায় ছাত্র-যুবদের প্রত্যক্ষ শ্রমে পোস্টার ছাপানো, বিলি ও টানানোর ব্যবস্থা হতো। স্ব স্ব এলাকায় স্থানীয় ছাত্র-যুবরাই প্রচারনার কাজ ও নির্বাচনের দিনে পোলিং এজেন্টের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

এই নির্বাচনের নির্বাচনী প্রচারকার্য চালাতে গিয়ে জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজ যেমনি জনগণের পেয়েছিল অকুণ্ঠ সমর্থন, তেমনি মোকাবেলা করতে হয়েছিল সামন্ত চিন্তাধারায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা সমাজের নানা কিসিমের প্রশ্ন ও অভিমত। এম এন লারমার নামের শেষে ‘চাকমা’ না হয়ে ‘লারমা’ থাকায় সামন্ত সমাজে লালিত চাকমা সমাজের অনেকে নানা প্রশ্ন করতে থাকেন। এমনকি প্রতিক্রিয়াশীল একটি মহল এ নিয়ে নানা অপব্যাখ্যা, অপবাদ করতে থাকলো। এসময় পাহাড়ি ছাত্র সমিতির ছাত্ররা নির্বাচনী এলাকায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। এম এন লারমার ‘লারমা’ টাইটেলের যথাযথ উত্তর দিয়ে খন্ডন করলো। এম এন লারমা স্বয়ং অনেক পরিশ্রম করে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে মানুষের সাথে বৈঠকী আলোচনা ও জনসভা করলেন। জুম্ম জনগণ যুগ যুগ ধরে কেন শাসিত-শোষিত, লাঞ্ছিত-বঞ্চিত ও অত্যাচারিত-নিপীড়িত, কেন কিভাবে অধিকার হারা হয়েছিল, কারা করেছিল, কিভাবে মুক্তি পেতে হবে ইত্যাদি সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিতে থাকেন। পরাধীনতা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিকল্প নেই বলে তিনি জুম্ম জনগণকে বুঝাতে লাগলেন। এম এন লারমার বক্তব্য শুনে জুম্ম জনগণ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাঁর সংগ্রামী আহ্বানে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। এভাবে জুম্ম জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের এই প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বকে সাদরে বরণ করে নেয়। ’৭০ সালের এই নির্বাচনে আওয়ামীলীগের প্রার্থীসহ অন্যান্য সকল প্রার্থীকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে এম এন লারমা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হিসেবে জয়যুক্ত হন।

সেই নির্বাচনে আওয়ামীলীগ প্রার্থী পরাজিত করে প্রাদেশিক পরিষদের পার্বত্যাঞ্চলের দক্ষিণাঞ্চল থেকে মুসলিম লীগ প্রার্থী মংশৈপ্রু চৌধুরী ও জাতীয় পরিষদে স্বতন্ত্র প্রার্থী চাকমা রাজা

ত্রিদিব রায়ও জয়যুক্ত হন। প্রাদেশিক পরিষদ থেকে এম এন লারমা এবং জাতীয় পরিষদে ত্রিদিব রায় নির্বাচনী সমঝোতার মাধ্যমে যৌথভাবে নির্বাচন করার জন্য ত্রিদিব রায়কে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল নির্বাচন পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে। এম এন লারমা স্বয়ং এই প্রস্তাব নিয়ে রাজা ত্রিদিব রায়ের নিকট গিয়েছিলেন। কিন্তু রাজা ত্রিদিব রায় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির এই প্রস্তাবে তেমন সায় দেননি। ফলে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে চারু বিকাশ চাকমাকে জাতীয় পরিষদে দাঁড় করানোর প্রস্তাব নেয়া হয়। কিন্তু চারু বিকাশ চাকমা একপর্যায়ে চুপিসারে ঢাকায় গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করেন এবং আওয়ামীলীগের টিকেটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য আওয়ামীলীগের সদস্যপদ নিয়ে রাঙ্গামাটিতে ফিরে আসেন। নির্বাচনের জন্য পাঁচ হাজার টাকাও শেখ মুজিব দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। ফলে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে চারু বিকাশ চাকমাকে জাতীয় পরিষদে দাঁড় করানোর পরিকল্পনাও ভেস্তে যায়।

জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল শক্তির নেতৃত্বে এম এন লারমার এই জয়ে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রাম এক নবদিগন্তের সূচনা করে। বিশেষ করে এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পাহাড়ি ছাত্র সমিতি অধিকতর উজ্জীবিত হয়ে উঠে এবং জুম্ম ছাত্র সমাজকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করার উদ্যোগ সহজতর হয়। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জুম্ম জনগণের অধিকার সচেতনতা ও ঐক্যশক্তির প্রতিফলন ঘটে। একদিকে জুম্ম জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগ্রামী করার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হতে থাকে, অপরদিকে প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী ও আপোষপন্থী সামন্ত নেতৃত্বের পরিবর্তনের জন্য নব্য চিন্তা ও চেতনা আর ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে থাকে। এম এন লারমার নেতৃত্বে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে শুরু হলো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। ন্যায্য অধিকার জুম্ম জনগণ পেতে চায়। ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়োজন জাতীয় নেতৃত্ব। ১৯৭০ সালের আহ্বান ও জাতীয় জাগরণ জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রামে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সংগ্রামরূপে জাতির ইতিহাসে অভ্যুদয় ঘটে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠন

বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলোর রাজনৈতিক কর্মসূচিতে উগ্র জাতীয়তাবাদী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক নীতি-আদর্শ পরিব্যাপ্ত থাকে। সাধারণভাবে এসব দলগুলো সাম্রাজ্যবাদী, আমলা পুঁজিবাদী, সামন্তবাদী ও মুৎসদ্দী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে থাকে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার মতো জাতিগত ও ভাষাগত সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহের সমস্যার প্রতি তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে প্রাধান্য দেয়া হয় না। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার প্রতি প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো সমর্থন প্রদান করলেও এ সমস্যা সমাধানেও সেসব দলগুলোর কোন নিজস্ব রাজনৈতিক কর্মসূচি নেই। দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির এমনিতর বাস্তবতায় মহান নেতা এম এন লারমা ও জুম্মদের প্রগতিশীল শক্তি নিজস্ব রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করতে থাকেন।

অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে হানাদার পাকিস্তান সরকার যা করতে সাহস করেনি, সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী তাই বাস্তবায়িত করতে থাকে। এতে জুম্ম জনগণ আরো শঙ্কিত হয়ে উঠে। একদিকে আওয়ামীলীগ সরকার ও তার সহযোগিতাদের অত্যাচার উৎপীড়ন, আর অপরদিকে দুষ্কৃতিকারীদের দৌরাত্মে জুম্ম জনগণের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে উঠলো। জনগণ সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থার জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়ালো। সমগ্র অঞ্চলে এক অচলাবস্থা দেখা দিল। জুম্ম জনগণ ঠিক এমনি সময়ে একটি রাজনৈতিক দলের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করতে থাকে। এসব ঘটনাবলী জুম্ম সমাজকে আরো স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিল যে, এসব নির্যাতিত ও বঞ্চিত জাতিসমূহের সংগ্রাম ব্যতীত বেঁচে থাকার অন্য কোন বিকল্প পথ নেই। আর সুসংগঠিত আন্দোলন পরিচালনার জন্য দরকার একটি নিজস্ব রাজনৈতিক দলের। ১৯৭০ সালে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম নির্বাচন পরিচালনা কমিটি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে জাতীয় জীবনের এমনিতর দুর্যোগপূর্ণ দিনে জুম্ম জনগণের পাশে এসে দাঁড়ায় ও দৃঢ়তার সাথে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করে যেতে থাকে। সেই সাথে একটা পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক দল গঠন করার কার্যক্রমও এগিয়ে চললো।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগলিক, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, ঐতিহাসিক কাল থেকে স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থা, সর্বোপরি জুম্ম জনগণের ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতিগত পরিচয় আলাদা হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ সংরক্ষণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই নিজস্ব রাজনৈতিক দল গড়ে তোলার পক্ষে এম এন লারমা, সন্তু লারমা, অমিয় সেন চাকমা, কালিমাধব চাকমাসহ তখনকার অধিকাংশ সচেতন ছাত্র-যুবক ও বুদ্ধিজীবীরা একমত ছিলেন। 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি' নামকরণে ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি জুম্ম জনগণের প্রথম রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়।

এম এন লারমাকে আহ্বায়ক করে সেদিন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়। জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবীসহ জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, অমিয় সেন চাকমা, কালিমাধব

চাকমার ভূমিকা ছিল শীর্ষস্থানীয়। তবে পরে পঙ্কজ দেওয়ান সক্রিয় ছিলেন না। এই দিনটি ছিল গোটা জুম্ম জাতির রাজনৈতিক তথা জাতীয় জাগরণের এক ঐতিহাসিক অবিস্মরণীয় দিন।

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সম্বলিত চারদফা দাবি

জুম্ম জনগণের নবগঠিত রাজনৈতিক দল জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে শুরু হলো নিয়মাতান্ত্রিক উপায়ে অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি জুম্ম জনগণের পক্ষ থেকে তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য এম এন লারমা এবং মং সার্কেলের রাজা মংপ্রুসাইন চৌধুরীর নেতৃত্বে ৭ সদস্যের এক জুম্ম প্রতিনিধিদল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সম্বলিত চার দফা দাবিনামা পেশ করেন। প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন কে কে রায়, বিনীতা রায়, সুবিমল দেওয়ান, জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা। জ্ঞানেন্দু বিকাশ তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেন যে, সেদিন শেখ মুজিবের সাথে দেখা হয়নি। স্মারকলিপি শেখ মুজিবের জনসংযোগ কর্মকর্তার নিকট স্মারকলিপিটি দিয়ে আসা হয়। উক্ত চারদফা দাবি ছিল নিম্নরূপ–

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হবে এবং ইহার একটি নিজস্ব আইন পরিষদ থাকবে।

২. উপজাতীয় জনগণের অধিকার সংরক্ষরণের জন্য '১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি'র ন্যায় অনুরূপ 'সংবিধি ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।

৩. উপজাতীয় রাজাদের দপ্তর সংরক্ষণ করা হবে।

৪. পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মতামত যাচাইয়ের ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টামের বিষয় নিয়ে কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বা পরিবর্তন যেন না হয়, এরূপ 'সংবিধি ব্যবস্থা' শাসনতন্ত্রে থাকবে।

উক্ত স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয় যে, 'সর্বকালের সর্বযুগে আদিমকালে থেকে শুরু করে মানব সভ্যতার বিকাশ পর্যন্ত প্রত্যেক জাতি ছোট হোক বড় হোক সমসময় নিজস্ব ধ্যান-ধারণার মাধ্যমেই আপন জাতীয় সংহতি ও জাতীয় পরিচিতি বজায় রাখবার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসনব্যবস্থা তুলে দিলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ছোট ছোট জাতিসমূহ শাসনব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে আপন আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে– ইহা যারা ভেবে দেখেছেন তাই ইহা একটি মারাত্মক ভুল ছাড়া কিছুই নয় এবং 'উপযুক্তরাই বেঁচে থাকবে'– এই প্রবাদটিও মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়ে যাবে। কারণ আমরা 'উন্নত জাতি তো নয়ই বরঞ্চ পিছিয়ে পড়া জাতি'– যাদের জীবন পদ্ধতি, উপজাতীয় সংহতি, সংস্কৃতি, সামাজিক সংগঠন, অভ্যাস, প্রথা, প্রবাদ ও ভাষা কলমের খোঁচায় মুছে দেওয়া যাবে না, এইজন্য এই জাতির নিরাপত্তার জন্য যে পৃথক আইন পরিচালিত একটি পৃথক অঞ্চলের প্রয়োজন ইহা পুরোপুরি অনস্বীকার্য।'

এম এন লারমার সেই কালজয়ী আহ্বানে বাংলাদেশের নব্য শাসকগোষ্ঠী সাড়া দিতে বিন্দুমাত্র এগিয়ে আসেনি। যে দেশের জনগণ জাতিগত অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতন, শোষণ ও বঞ্চণার বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করেছিল, সেই দেশেরই প্রধানমন্ত্রী শহীদের রক্ত শুকাতে না শুকাতেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে পদদলিত করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের ন্যায্য দাবিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেন। এসব দাবিনামার প্রতি কোন বিচার বিবেচনা না করেই একতরফাভাবে জুম্ম জনগণকে 'বাঙালি' হিসেবে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান হুমকি দেন যে, বেশি বাড়াবাড়ি করলে পার্বত্য চট্টগ্রামে ১০ লাখ বাঙালি ঢুকিয়ে দেয়া হবে। কার্যত তারপর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার উপনিবেশিক পাকিস্তানী আমলের অসমাপ্ত কার্যক্রম সমাপ্ত করার কাজ শুরু করা হয়েছিল। তারই অংশ হিসেবে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর করা হয় পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক সামরিকায়ন।

১৯৭২ সালের ১৭ জুলাই পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে সাপ্তাহিক 'লাল পতাকা'য় প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে এম এন লারমা বলেছিলেন, 'প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘদিন স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলন করেছেন এবং বহু ত্যাগ স্বীকার ও নির্যাতন ভোগ করেছেন। এখন পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানের সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন ও মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন। এ অবস্থায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামীলীগ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসনের ন্যায় সংগ্রাম দমনের নীতি গ্রহণ করতে পারেন না। কারণ দমননীতি প্রতিরোধ সংগ্রামের শক্তি বাড়াবে।' কৃষক সমিতির জনৈক কর্মীর এক বিবৃতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে এম এন লারমা বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসন-বিরোধী ভূমিকা তাদের নীতি ও আদর্শগত দেউলিয়াপনার স্বরূপ উদঘাটন করেছে। এটা তাদের জন্য মৃত্যুবাণ হবে। লেনিনবাদই জাতি সমস্যা সমাধানের সঠিক পথ-নির্দেশক। ভারত সাড়ে তিন লাখ মিজোর জন্য মিজোরাম গঠন করেছে। বাংলাদেশে ৬ লাখ উপজাতির জন্য স্বায়ত্তশাসন অযৌক্তিক হতে পারে না' (খীসা, ১৯৯৬)।

জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনকারী দেশের মহান সংগ্রামী নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জুম্ম জনগণ ভেবেছিলেন আশা-ভরসার একমাত্র শেষ স্থল। অথচ তাঁর জাত্যভিমানী ও দাম্ভিক উক্তিতে জুম্ম নেতৃবৃন্দ যারপরনাই হতাশ ও বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। জুম্ম জনগণের ন্যায্য দাবির প্রতি অপরিসীম আত্মত্যাগের ফলে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতির বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করায়, বরং উল্টো বাড়াবাড়ি না করার প্রচ্ছন্ন হুমকি জুম্ম জনগণকে চরম আশাহীন করে তুলে। ফলে আশাভঙ্গের বেদনা, হতাশা ও বঞ্চনায় জুম্ম জনগণ আন্দোলনে ফুঁসে উঠতে থাকে। যত বড় মহান নেতা হোক না কেন, জুম্ম জনগণকে কেউ আপন করে না ভাবে না বা ভাববে না, তাই জুম্ম জনগণকে নিজেরাই নিজেদের পথ বেছে নিতে হবে– এই দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণা তাদের মধ্যে বদ্ধমূল হতে থাকে।

এম এন লারমার সংসদীয় লড়াই

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম অধ্যায় হচ্ছে তাঁর দূরদর্শীসম্পন্ন, নির্ভীক ও প্রাজ্ঞ সংসদীয় সংগ্রাম, যা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের অন্যতম অংশ। বস্তুত তাঁর সংসদীয় জীবন শুরু হয় ১৯৭০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে জয়যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামীলীগের ভূমিধস জয় হলে 'পরে পাকিস্তানের তৎকালীন স্বৈরাচারী ইয়াহিয়া সরকার ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সেই নির্বাচনী ফলাফলকে মেনে নেয়নি এবং আওয়ামীলীগকে সরকার গঠন করতে দেয়নি। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নিয়ে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের গণপরিষদ গঠিত হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ ১৯৭২ এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আইন জারি করে ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। গণপরিষদের ৪০৪ জন সদস্যের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এম এন লারমা। গণপরিষদের অন্যতম দায়িত্ব ছিল সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য সংবিধান প্রণয়ন করা।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসন কাঠামো এবং জুম্ম জনগণের স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তা ও বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষাপটে সংবিধানে সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য এম এন লারমা সংবিধান প্রণয়ন কমিটির নিকট এবং গণপরিষদে স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরেন। দফাওয়ারী সংবিধান-বিল বিবেচনাকালে তিনি ২ নভেম্বর ১৯৭২ তারিখে সংবিধানে ৪৭ক অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্তির জন্য গণপরিষদে প্রস্তাব তুলে ধরেন যে, '৪৭ক। পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি উপজাতীয় অঞ্চল বিধায় উক্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারের নিরাপত্তার জন্য উক্ত অঞ্চল একটি উপজাতীয় স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হইবে।'

সংশোধনী প্রস্তাবের পক্ষে গণপরিষদে যৌক্তিকতা তুলে ধরতে গিয়ে এম এন লারমা বলেছিলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রামে আমরা দশটি ছোট ছোট জাতি বাস করি। চাকমা, মগ (মারমা), ত্রিপুরা, লুসাই, বোম, পাংখো, খুমি, খিয়াং, মুরং ও চাক– এই দশটি ছোট ছোট জাতি সবাই মিলে আমরা নিজেদেরকে 'পাহাড়ি' বা জুম্ম' জাতি বলি। ...ভারত দখল করার পর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই উপমহাদেশে শাসনকার্য পরিচালনা করার জন্য বিভিন্নভাবে আইন-পদ্ধতি প্রয়োগ করে শোষণ ব্যবস্থার পত্তন করে। ব্রিটিশ এই উপমহাদেশ দখল করার পর এই দেশকে বিভিন্ন এলাকায় ভাগ করে নিয়ে শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তন করে যায়। সেই শাসন-পদ্ধতি আমরা ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামল থেকে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন পর্যন্ত দেখতে পাই। ব্রিটিশ তার সাম্রাজ্য রক্ষার সুবিধার্থে কাউকে বেশি, কাউকে মাঝামাঝি, কাউকে কম অধিকার দিয়ে এ দেশে শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল। ..তারপর তথাকথিত পাকিস্তানের সময়ও ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত– প্রথম সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত সেই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন দ্বারাই পরিচালনা করা হয়। তারপর ১৯৫৬ সালের প্রথম সংবিধান এবং স্বৈরাচারী আইয়ুবের ১৯৬২ সালের সংবিধানেও পার্বত্য চট্টগ্রামকে ঐ রেগুলেশনের দ্বারা শাসিত এলাকা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে আগে আমার বক্তব্য তুলে ধরতে পারি নাই ভালোভাবে। আমরা যে পিছনে পড়ে আছি, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। আমি এখানে জামা-প্যান্ট পরে বাবু সেজে আছি, কিন্তু আপনারা যদি পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় যান, তাহলে দেখতে পাবেন, যেখানে আমাদেরই জাতি-ভাই এখনও নগ্ন অবস্থায় রয়েছে, এখনও সেই আদিম যুগে পড়ে রয়েছে। এখনও যে আমরা পেছনে পড়ে আছি, সেই অবস্থা, সেই করুণ অবস্থা– যদি আপনারা একবার দেখতেন, তাহলে বুঝতে পারতেন।'

এম এন লারমার 'পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি উপজাতীয় অঞ্চল বিধায় উক্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারের নিরাপত্তার জন্য উক্ত অঞ্চল একটি উপজাতীয় স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল' হিসেবে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা সংক্রান্ত সেই সংশোধনী প্রস্তাব শাসকদলের উগ্র জাতীয়তাবাদী দাম্ভিকতায় সেদিন প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাসে ৩১ অক্টোবর ১৯৭২ একটি ঐতিহাসিক কালো দিন। ঐদিন আওয়ামী লীগের সদস্য আহম্মদ রাজ্জাক ভূঁইয়ার প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন' সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণের মধ্য দিয়ে স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তার অধিকারী জুম্ম জনগণসহ দেশের প্রায়

৫৪টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে সাংবিধানিকভাবে বাঙালি বলে আখ্যায়িত করা হয়। এই সংশোধনীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এম এন লারমা বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেছিলেন–

> 'আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি, সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে বাস করে আসছে। বাংলাদেশের বাংলা ভাষায় বাঙালিদের সঙ্গে লেখাপড়া শিখে আসছি। বাংলাদেশের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সব দিক দিয়েই আমরা একসঙ্গে একযোগে বসবাস করে আসছি। কিন্তু আমি একজন চাকমা। আমার বাপ, দাদা, চৌদ্দ পুরুষ– কেউ বলে নাই, আমি বাঙালি।'

তিনি আরো বললেন– 'একজন বাঙালি যেমন কোনদিন চাকমা হতে পারে না, অনুরূপভাবে একজন চাকমাও কোন দিন বাঙালি হতে পারে না।' এম এন লারমার তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সেদিন তৎকালীন আওয়ামীলীগ সরকার সংবিধানের সেই বর্ণবাদী সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল এবং ভিন্ন জাতিসত্তার অধিকারী জুম্ম জাতিসমূহকে বাঙালি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। এম এন লারমা সেদিন এই সংশোধনীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে গণপরিষদের অধিবেশন বর্জন করেছিলেন এবং সংবিধানে স্বাক্ষর প্রদান থেকে বিরত থাকেন।

এম এন লারমার আবেগময়ী ও অনলবর্ষী ভাষায় যুক্তি তুলে ধরার পরও গণপরিষদে গৃহীত সংবিধানে জুম্ম জাতিসমূহকে বাঙালি হিসেবে অভিহিত করা এবং সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান হওয়ার পর তিনি ব্যর্থ মনোরথ নিয়ে রাঙ্গামাটিতে ফিরে আসলেন। এদিকে তাঁর সহকর্মীরা অধিবেশনের ফলাফল শোনার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি ফিরে এসে রাগে দুঃখে ক্ষোভে বললেন, 'না, এভাবে আর হবে না।' কঠোর কঠিন সংগ্রামের পথ ধরতে হবে। তিনি তাঁর সহকর্মীদের সামনে বাংলাদেশ সরকারের হীন কার্যকলাপের চিত্র তুলে ধরলেন।

সর্বাত্মক জোরালো নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় অঞ্চল হিসেবে বিশেষ শাসন শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসের দাবির বিপরীতে জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাত তুলে তৎকালীন আওয়ামীলীগ সরকার ১৯৭৩ সালে দীঘিনালা, রুমা ও আলিকদমে তিনটি সেনানিবাস স্থাপন করে। রাজাকার দমনের নামে শুরু হয় অধিকারকামী জুম্মদের উপর দমন-পীড়ন। সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক সামরিক অভিযান চলতে থাকে। তার বিপরীতে শুরু হয় অধিকারকামী জুম্ম জনগণের জোরালো সর্বাত্মক নিয়মতান্ত্রিক লড়াই। পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যাধিক্যে এম এন লারমা এবং দক্ষিণাঞ্চল থেকে চাথোয়াই রোয়াজার জয়লাভে গতি সঞ্চার করলো জুম্ম জনগণের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে। আপামর জুম্ম জনগণ অধিকতর ঐক্যবদ্ধ হলো। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে এই ঐতিহাসিক বিজয়ের ফলশ্রুতিতে সুদৃঢ় ও সুগম হলো নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সংগ্রামের পথ। এরপর ভবিষ্যত রাজনৈতিক কর্মসূচি ও কলাকৌশল নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা হলো। আলোচনার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে পুনরায় ডেপুটেশন দেয়া হবে স্বয়ং শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে। যথাসময়ে ১৯৭৩ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বৈঠকে মিলিত হলেন এক জুম্ম প্রতিনিধিদল। এই ডেপুটেশনেও ২২ সদস্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মহান নেতা এম এন লারমা। প্রতিনিধিদলের অন্যান্যের মধ্যে বোমাং রাজা অংশৈ প্রু চৌধুরী, বীরেন্দ্র কিশোর রোয়াজা, নকুল চন্দ্র ত্রিপুরা, উপেন্দ্র লাল চাকমা, চারু বিকাশ চাকমা, অনন্ত বিহারী খীসা, খুলারাম চাকমা, দীপঙ্কর চাকমা, সিটি প্রু, ভগদত্ত খীসা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ছিলেন অন্যতম। এই ডেপুটেশনেও দাবি করা হয়েছিল জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থা ও অধিকার।

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে উপেন্দ্র লাল চাকমা সংসদ সদস্য বলেছিলেন যে, উক্ত বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'লারমা তুমি কি মনে কর। তোমরা আছ ৫/৬ লাখ। বেশি বাড়াবাড়ি করো না। চুপচাপ করে থাক। বেশি বাড়িবাড়ি করলে তোমাদেরকে অস্ত্র দিয়ে মারবো (হাতের তুড়ি মেরে মেরে তিনি বলতে লাগলেন)। প্রয়োজনে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ...১০ লাখ বাঙালি ঢুকিয়ে তোমাদেরকে উৎখাত করবো, ধ্বংস করবো।' সেদিন শেখ মুজিবুর রহমান জুম্ম প্রতিনিধিদলের স্মারকলিপিও গ্রহণ করেননি। এমনকি প্রতিনিধিদলকে বসার জন্য সৌজন্যবোধও দেখাননি বলে জানা গেছে। আলোচনা ৪/৫ মিনিটেই শেষ করে দেন মহান মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান।

লেখকের সাথে এক সাক্ষাৎকারে রূপায়ন দেওয়ান জানিয়েছেন যে, উক্ত ডেপুটেশনের পর জুম্ম প্রতিনিধিদল ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ঢাকাস্থ বেইলি রোডে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবনে একটি আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মান্নান, তৎকালীন এটর্নী জেনারেল এবং গণপরিষদের একজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত বৈঠকেও মূল দাবি ছিল আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের, যা সরকারের প্রতিনিধিদল তীব্র বিরোধিতা করে এবং সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে। এভাবেই নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অধিকার আদায়ের সকল পথ রুদ্ধ হতে থাকে।

এমনিতর অবস্থায় কঠোর কঠিন আন্দোলন সংগঠিত করার লক্ষ্যে এম এন লারমার দিক-নির্দেশনায় জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ি ছাত্র সমিতির নেতৃবৃন্দ সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম গণসংগঠনের কাজে নেমে পড়লেন। তারা এলাকায় এলাকায় দিনের পর দিন অব্যাহতভাবে এলাকার মুরুব্বী, গণ্যমান্য ব্যক্তি, নারী, ছাত্র-যুব সমাজসহ আপামর মানুষের সাথে মতবিনিময় করতে থাকেন। এম এন লারমার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতির পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলে জুম্ম জনগণকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ে উজ্জীবিত করতে থাকেন। জুম্ম জনগণ জনসংহতি সমিতির কর্মী ও ছাত্রদেরকে সাদরে গ্রহণ করেন। যেখানে কর্মীরা গেছেন সেখান স্থানীয় জনগণ তাদের সভা-সমাবেশের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতীয় জাগরণের এক গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠে। জুম্ম জনগণ অধিকার আদায়ের সংগ্রামে আরো সক্রিয় ও সংগ্রামী হয়ে উঠে। পার্বত্য চট্টগ্রামের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী তথা ভিন্ন ভাষাভাষী আপামর জনসাধারণ আরো ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠে। এভাবে বাংলাদেশ সরকারের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জুম্ম জনগণের নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম এগিয়ে যেতে থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা ও সমাধানের জন্য এম এন লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে কানাছে ঘুরে বেরিয়েছেন। তিনি স্বচক্ষে এবং অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছেন পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের সমস্যা। পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন, অধ্যয়ন করেছেন এবং চুলছেড়া বিশ্লেষণও করেছেন তিনি। তিনিই জাগিয়ে তুলেছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘুমন্ত জুম্ম জনগণকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রামে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বুদ্ধিজীবী, ছাত্র সমাজ ও সমাজের সকল স্তরের জনগণের সাথে আলাপ আলোচনা করেছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে। তিনি তৎকালীন পাকিস্তান ও বাংলাদেশের বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী, মধ্যপন্থী সকল রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্য ও তার সমাধান সম্পর্কে বিস্তারিত ও বহুবার আলোচনা চালিয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যাকে দু'একজন রাজনৈতিক নেতা ব্যতীত কেউ অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেননি। তাদের মধ্যে একমাত্র ন্যাশনালিষ্ট আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) এর প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ ভাসানী এবং পূর্ব পাকিস্তানের একসময়ের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অধিকার আদায়ের জন্য প্রয়োজনে অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে এম এন লারমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। অবশিষ্ট প্রায় সকল রাজনৈতিক নেতৃবর্গ নিজ নিজ দলীয় স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে দেখতেন। তাঁর জীবদ্দশায় আলাপ প্রসঙ্গে আক্ষেপ করে প্রায়ই বলতেন তৎকালীন পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাজনীতিকদের পার্বত্য চট্টগ্রাম রাজনৈতিক সমস্যার উপেক্ষামূলক কথা ও আচরণ। কৃতজ্ঞতা ভরে স্মরণ করতেন দু'একজন রাজনীতিকের কথাও। উক্ত রাজনীতিকরা শুধু চেয়েছিলেন তাঁকে ব্যবহার করে পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের নিজ নিজ দলীয় শাখা গঠন করতে। কিন্তু তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল রাজনৈতিক সমস্যাকে বাদ দিয়ে কোন ধরনের রাজনীতি করতে রাজী ছিলেন না। স্বার্থের রাজনীতির তিনি ছিলের বিরোধী।

ঘটনাপ্রবাহ দ্রুত পট পরিবর্তন হতে থাকে। পাহাড়ি ছাত্র সমিতির নেতৃত্বে সমগ্র জুম্ম ছাত্র সমাজ জনসংহতি সমিতির পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। আর জনসংহতি সমিতির পাশাপাশি পাহাড়ি ছাত্র সমিতি স্বায়ত্তশাসন আদায়ের সংগ্রাম চালিয়ে নিতে থাকে। ১৯৭২ সালের (মতান্তরে ১৯৭৩) পাহাড়ি ছাত্র সমিতির বার্ষিক সম্মেলন রাঙ্গামাটির তবলছড়িস্থ আর্ট কাউন্সিল মিলনায়তনে যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন অনুষ্ঠানে স্নেহময় চাকমা ঝুনু, রূপায়ণ দেওয়ান, উষাতন তালুকদার, গৌতম কুমার চাকমা, চন্দ্রশেখর চাকমা, চাবাই মগ প্রমুখ ছাত্র নেতৃবৃন্দ নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। সম্মেলনে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে অধিকার আদায়ের সংগ্রাম অব্যাহত গতিতে চালিয়ে নিতে জুম্ম ছাত্র সমাজ নতুন করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। এভাবে এগিয়ে যেতে থাকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জুম্ম জনগণের প্রাণের দাবি– আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের সংগ্রাম।

বাকশাল গঠন ও এম এন লারমার যোগদান

১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান এক আদেশ বলে দেশের সব রাজনৈতিক দল বিলুপ্তির মাধ্যমে 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামীলীগ' (বাকশাল) নামে একটি জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা দেন। জাতীয় ঐক্যের দোহাই দিয়ে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীতে বিধান রাখা হয় যে, 'রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বাকশালে যোগদান না করে কোনো ব্যক্তি সংসদ-সদস্য পদে বহাল থাকতে পারবেন না।' ফলে এম এন লারমার পক্ষে বাকশাল যোগ দেয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না। জাতীয় স্বার্থে সংসদ সদস্য পদ বাঁচিয়ে রাখার জন্য তিনি

বাকশালে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এম এন লারমার বাকশালে যোগদানে আরেকটি কারণ ছিল, সেটা হলো তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান এম এন লারমাকে আশ্বস্থ করেছিলেন যে, তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিবেন এবং জুম্ম জনগণের দাবিদাওয়াসমূহ বিবেচনা করবেন। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের স্বার্থে এবং রাজনৈতিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার অনুকূল অবস্থা বজায় রাখার লক্ষ্যে এম এন লারমা সেদিন বাকশালে যোগদানে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ে সশস্ত্র আন্দোলন

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও পাহাড়ি ছাত্র সমিতির নেতৃত্বে জুম্ম জনগণের পক্ষ থেকে বার বার প্রতিনিধিত্ব করা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার জুম্ম জনগণের মৌলিক সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসেনি। বরঞ্চ পরিবর্তে সংবিধানে জুম্ম জনগণকে বাঙালি হিসেবে পরিণত করা হয়। জুম্ম জনগণের উপর লুণ্ঠন, ধর্ষণ, হত্যা, ধরপাকড় ও অন্যান্য নাশকতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখে, সর্বোপরি ব্যাপকভাবে বেআইনী বাঙালি মুসলমান অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব চিরতরে ধ্বংস করার নির্মম ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। বৈদেশিক আক্রমণের দোহাই দিয়ে দীঘিনালা, আলিকদম ও রুমায় তিনটি সেনানিবাস স্থাপন করা হয়। গণপ্রতিনিধির মাধ্যমে পেশকৃত জুম্ম জনগণের সকল দাবি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যাত হতে থাকে। ফলে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যেতে থাকে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান স্বপরিবারে নিহত হলে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল পথ একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে দেশে সামরিক শাসন জারির ফলে সংবিধানের কিছু মৌলিক অধিকার স্থগিত করা হয়। সভা-সমিতি, বাক-স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। শুরু হয় ব্যাপকভাবে ধর-পাকড়, জেল-জুলুম, দমন-পীড়ন। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারাদেশে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে। এমনিতর পরিস্থিতিতে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে জুম্ম জনগণ অনিয়মতান্ত্রিক তথা সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়।

বিভেদপন্থী চক্রের উপদলীয় চক্রান্ত ও গৃহযুদ্ধ

মহান নেতা এম এন লারমার প্রদর্শিত পথে জনসংহতি সমিতি সংগ্রামের নীতি ও কৌশল নির্ধারণ করে যে, নীতিগতভাবে আত্মনির্ভরশীল হওয়া ও কৌশলগতভাবে জাতি-ধর্ম-দল-মত নির্বিশেষে সাহায্য চাওয়া ও বন্ধু গড়ে তোলা; এবং নীতিগতভাবে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম করা ও কৌশলগতভাবে দ্রুত নিষ্পত্তির লড়াই করা। কিন্তু পার্টির মধ্যে লুকিয়ে থাকা সুবিধাবাদী, ক্ষমতার উচ্চাভিলাষী, দুর্নীতিবাজ ও দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের তাবেদার ভবতোষ দেওয়ান (গিরি), প্রীতি কুমার চাকমা (প্রকাশ), দেবজ্যোতি চাকমা (দেবেন) ও ত্রিভঙ্গিল দেওয়ান (পলাশ) চক্র জনসংহতি সমিতির এই আদর্শ ও নীতি-কৌশলকে গ্রহণ করতে পারেনি। তারা তাদের হীন মুখোশ পার্টির মধ্যে বেশি দিন লুকিয়ে রাখতে পারেনি।

জনসংহতি সমিতির ১৯৭৭ সালে (১৭ মে থেকে ২০ মে ১৯৭৭) প্রথম জাতীয় সম্মেলনে সুবিধাবাদী ও সুযোগসন্ধানীদের সেই মুখোশ উন্মোচিত করতে চেষ্টা করে। জাতীয় সম্মেলনে প্রকাশ-দেবেন চক্র অবৈধভাবে নেতৃত্বের ভাগীদার হওয়ার উচ্চাভিলাষ গোপন রাখতে পারেনি। কিন্তু পার্টি নেতৃত্বের পক্ষে নেতৃস্থানীয় সদস্য গৌতম কুমার চাকমা অশোকের বাস্তব পরিস্থিতির উপর যুক্তিপূর্ণ পর্যালোচনামূলক ভাষণে সেবার এই চক্রটি কিস্তিমাত হয়ে যায়। '৭৭-এর জাতীয় সম্মেলনে এম এন লারমাকে সভাপতি, সন্তু লারমাকে সহ সভাপতি ও ফিল্ড কমান্ডার, যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরাকে সহ সভাপতি, ভবতোষ দেওয়ানকে সাধারণ সম্পাদক, গৌতম কুমার চাকমাকে তথ্য ও প্রচার সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সম্মেলন সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলেও সুবিধাবাদী উচ্চাভিলাষী হোতাদের মনের বাসনা পুষে যেতে থাকে। একদিকে রাজনৈতিক উৎপ্রাসন, অন্যদিক সামরিক ব্যর্থতার গ্লানি বৈপ্লবিক কাজে তাদেরকে পোড়ামুখ করে তোলে। '৭৬ সালে রেইংখ্যং অভিযানে ভবতোষ দেওয়ান (গিরি)-এর চরম ব্যর্থতা, নিজেদের রাজনৈতিক ও সামরিক জীবনে ব্যর্থতা, '৭৭ সালে চাবাই মগ (মংলাউ)-এর এমএনএফ অভিযানের ব্যর্থতা, '৭৯ সালে ত্রিভঙ্গিল চাকমা (পলাশ)-এর বগাপাড়া অপারেশনের লজ্জাজনক ও শোচনীয় ব্যর্থতা, '৮১ সালে দেবজ্যোতি চাকমা (দেবেন)-এর 'টি' জোন অভিযানের বিফলতা আর প্রীতিকুমার চাকমা (প্রকাশ)-এর মুরুব্বিয়ানাসহ তাদের দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি ধামাচাপা দেওয়ার জন্যে উক্ত সম্মেলনে তারা উপদলীয় চক্রান্তের মাধ্যমে পার্টির সর্বময় ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পাঁয়তারা শুরু করে। সে যাত্রায় তারা সফল হতে পারেনি। কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রামকে গলাটিপে হত্যা করে সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শিবিরের শক্তি বৃদ্ধিতে 'পঞ্চম বাহিনী'র ভূমিকা পালন করতে থাকে।

তাই দেশী-বিদেশী গুপ্তচরের ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে চার কুচক্রী এই জুম্ম জাতির সর্বনাশ সাধনে উদ্যত হয়। শুরু হয় উপদলীয় চক্রান্তের আনুষ্ঠানিক পাঁয়তারা, বৃদ্ধি পায় ছিদ্রানুন্ধান ও পরস্পরের বিরুদ্ধে কাঁদা ছুড়োছুড়ি। শেষ পর্যন্ত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের গতিপথে ক্রমাগত উদ্যোগশক্তির ভাটা পড়তে থাকে লক্ষণীয়ভাবে।

১৯৭৮ সালে সুকৌশলে প্রীতিকুমার চাকমা (প্রকাশ)-এর পূর্ণ ষড়যন্ত্রে গুলিবিদ্ধ ভবতোষ দেওয়ান (গিরি) সুস্থ হয়ে কাজে যোগ দেওয়ার মতো অবস্থা সৃষ্টি হলো। এ সময় জুম্ম বুদ্ধিজীবী, ছাত্র-যুবকরা আন্দোলনে দলে দলে যোগদান করতে থাকে। সর্বস্তরে গঠন ও পুনর্গঠন চললো এগিয়ে। ১৯৮০ সালের ২২ জানুয়ারি জনসংহতি সমিতির প্রবীন সদস্য শান্তিবাহিনীর ফিল্ড কম্যান্ডার জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বন্দী অবস্থা থেকে বিনাশর্তে মুক্তি পেলেন ও কাজে যোগ দিলেন। তাঁর বীরোচিত ভূমিকা ও উদ্যমের ফলে পার্টির নিভু নিভু প্রদীপে যেন তৈল ও সলিতা যোগ হয়। সমস্ত পার্টির মধ্যে নতুন করে প্রাণের সঞ্চার শুরু হতে থাকে, যার ফলে নতুন কর্মশক্তিতে পার্টি আরো গতিময় ও সচল হয়ে উঠে। ঠিক সেই মুহূর্তে বাঁধ সাধলো ঐ নিষ্কর্মা, দুর্নীতিবাজ ও ক্ষমতালোভী বিভেদপন্থী চক্র, যারা আদর্শচ্যুত হয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ হয়ে পড়লো। বাস্তব পরিস্থিতিকে সঠিকভাবে বিশ্লেষন ও মূল্যায়নে অক্ষম এবং স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতিপরায়ণতা থেকে মুক্ত হয়ে শৃঙ্খলা সহকারে ত্যাগ, সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করতে অসমর্থ প্রীতি কুমার চাকমা (প্রকাশ) ও দেবজ্যোতি চাকমা (দেবেন) বিরোধিতা করতে থাকে। তাদের সাথে যোগ দিলো ভবতোষ দেওয়ান (গিরি), সনদ কুমার চাকমা (সাগর), ত্রিভঙ্গিল দেওয়ান (পলাশ), বিলাস ও অন্যান্য ক্ষমতালোভী উচ্চাভিলাষী ও দুর্নীতিবাজরা। একপর্যায়ে ক্ষমতার উচ্চাভিলাষী, সুবিধাবাদী ও বিভেদপন্থী এই গোষ্ঠী অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পার্টির সর্বময় ক্ষমতা দখলের অপচেষ্টা চালাতে থাকে।

একদিকে বাংলাদেশ সরকার, অন্যদিকে গৃহশত্রু সুবিধাবাদী গোষ্ঠী– এই দুই শত্রুর সঙ্গে ক্রমাগত জনসংহতি সমিতি মোকাবেলা করে আসতে থাকে। ১৯৮২ সাল জুম্ম জাতীয় জীবনের ইতিহাসে এক দুর্যোগপূর্ণ বছর। এই বছরে এতদিনে লুকিয়ে থাকা সেই প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী গোষ্ঠী আরো মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে ও ক্ষমতার লোভে উচ্চাভিলাষী হয়ে, সর্বোপরি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক গুপ্তচর, দালাল ও ফক্করদের চক্রান্তে জড়িত হয়ে এক উপদলীয় চক্রান্ত শুরু করে দেয়। ১৯৮২ সালের ২৪-২৭ সেপ্টেম্বর জনসংহতি সমিতির দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পানছড়ি থানাধীন এক গভীর জঙ্গলে অস্থায়ী ব্যারাক নির্মাণ করে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপদলীয় চক্রান্তকারীরা পার্টির নীতি ও কৌশল তথা নেতা ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা উপস্থাপন করে থাকে এবং সশস্ত্রভাবে ক্ষমতা দখলের ব্যর্থ অপপ্রয়াস চালায়। বক্তৃতা মঞ্চে উঠে অপ্রত্যাশিতভাবে দেবজ্যোতি চাকমা পলাশ উদ্যত কণ্ঠে ঘোষণা করে যে, তারা দলীয় নীতি, আদর্শ ও কৌশলের প্রতি সন্দিহান হয়ে পড়েছে। এই চক্রান্তকারীরা দ্রুত নিষ্পত্তির মতো অবাস্তব ও সস্তা শ্লোগানে বিভ্রান্ত করে রাতারাতি দেশ উদ্ধারের নীতি ও কৌশল প্রতিষ্ঠা করতে গালভরা বুলি আওড়ায়। পলাশের বক্তব্যের বিপরীতে উষাতন তালুকদারের কড়া ভাষায় বক্তব্য দেন এবং পলাশের বক্তব্যের খন্ডন করেন। এভাবে পাল্টাপাল্টি বক্তব্য চলতে থাকে।

তখন সুদক্ষ কাণ্ডারী দলীয় নেতা এম এন লারমা খুবই শান্ত, ধীর ও গঠনমূলক অথচ অতীব যুক্তিযুক্ত অভিভাষণে বাস্তব পরিস্থিতি সঠিক মূল্যায়ন করে গোটা পার্টি ও জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনের উপর ঐতিহাসিক রূপরেখা শোনালেন। তিনি বললেন, 'দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের খাতিরে কি দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে? আসলে এই প্রশ্নের উৎপত্তির কারণ হচ্ছে অসহিঞ্চুতা ও অধৈর্য থেকে। সংগ্রাম দ্রুত নিষ্পত্তি হয়ে যাক, শান্তি ফিরে আসুক দ্রুত– এই কামনা সবাইয়ের। কিন্তু কারোর ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী বা দ্রুত নিষ্পত্তি হয় না। বাস্তবমুখী বাস্তবতা ও আত্মমুখী প্রস্তুতির নিরিখেই সংগ্রামের গতি নির্ধারিত হয়। তাই জনসংহতি সমিতিকে অবশ্যই আত্মমুখী প্রস্তুতি বা বাস্তবমুখী বাস্তবতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সংগ্রামের প্রতিটি কার্যক্রমকে নির্ধারণ করতে হবে। রণনীতিগতভাবে দীর্ঘস্থায়ী অর্থাৎ আত্মমুখী প্রস্তুতি সত্যিকারভাবে বাস্তবমুখী বাস্তবতার সাথে সমন্বয় সাধন করে রচনা করা হয়েছে কিনা– এটিই হচ্ছে সংগ্রামের কার্যক্রমের প্রধান ধারা। বাস্তবতাকে এড়িয়ে, বাস্তবতাকে অস্বীকার করে আত্মমুখী প্রস্তুতির অর্থ হচ্ছে সংগ্রামকে বিপথে পরিচালিত করা, সংগ্রামকে বানচাল করা। তাই জনসংহতি সমিতিকে এজন্য অবশ্যই সচেতন হওয়া উচিত। কর্মীবাহিনীকে অবশ্যই অসহিষ্ণুতা ও অধৈর্যের বিরুদ্ধে নিরলসভাবে সংগ্রাম করতে হবে। এই অসহিষ্ণুতাও অধৈর্য হঠকারীতাবাদ, রক্ষণশীলতাবাদ ও পলায়নবাদের প্রবণতা প্রকাশ করে দেয়।' এম এন লারমার এই ভাষণ এতই জোরালো ও যুক্তিপূর্ণ ছিল যে, তাতে জোঁকের মুখে ছাঁই পড়ার মতো হলো উপদলীয় চক্রান্তকারীদের।

একপর্যায়ে জাতীয় সম্মেলনের সিদ্ধান্তে যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা নির্মল-এর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠিত হয়। নির্বাচন সম্পর্কিত নীতিমালার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– প্রত্যেক ভোটারকে নিজেকেসহ প্যানেলে

অন্তর্ভুক্ত ২৯ জনকে টিক চিহ্ন দিয়ে 'হ্যাঁ' বা 'না' ভোট প্রদান করতে হবে। যে সদস্য 'না' ভোট বেশি পাবেন তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পদে নির্বাচিত হবেন না। 'হ্যাঁ' ও 'না' ভোট সমান সমান হলে সেক্ষেত্রে কমিটির প্রধান একটি নির্ধারক ভোট প্রদান করবেন। ২৯ সেপ্টেম্বর গোপন ব্যালটে জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যা ছিল জনসংহতি সমিতির ইতিহাসে গোপন ব্যালটে অনুষ্ঠিত প্রথম ও একমাত্র নির্বাচন। বিভেদপন্থীদের বিবেচনায় পাঁচজন 'বিতর্কিত' সদস্যরা হলেন– এম এন লারমা, সন্তু লারমা, অমিয় সেন চাকমা, অনাদি রঞ্জন চাকমা ও গৌতম কুমার চাকমা। আর পার্টির বিবেচনায় পাঁচজন 'বিতর্কিত' সদস্য হলেন– প্রীতি কুমার চাকমা, সনৎ কুমার চাকমা, ত্রিভঙ্গিল দেওয়ান, দেবজ্যোতি চাকমা ও হরিকৃষ্ণ চাকমা। ৪৯ জন প্রতিনিধির গোপন ব্যালেটে ভোট প্রদান সমাপ্ত হলে দেখা যায়, উভয়পক্ষের 'বিতর্কিত' সদস্যদের চিহ্নিত করা গেলেও কেউ 'না' ভোট ৫০% বা ততোধিক লাভ করেননি। ফলে 'বিতর্কিত' কোন সদস্য কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচনে পরাজিত করা সম্ভব হয়নি।

এভাবে এম এন লারমার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা এবং তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ১৯৮২ সালের জাতীয় সম্মেলন সুসম্পন্ন হয়। এই সম্মেলনেও তৃতীয়বারের মতো সর্বসম্মতিক্রমে এম এন লারমাকে পার্টির সভাপতি পদে নির্বাচিত করা হয়। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন ভবতোষ দেওয়ান। কিন্তু ক্ষমতালোভী চক্রান্তকারীরা সম্মেলনের রায় মেনে নিলেও চক্রান্তের নাটক এখানে শেষ করেনি। সম্মেলনের পর এরা আবার নতুন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলো। অতি সঙ্গোপনে, গোপন বৈঠকে তারা জনসংহতি সমিতির সমান্তরাল আরেকটি পার্টি সৃষ্টি করে সেখানে একটি নয় সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে। কমিটির নাম দিল জাতীয় গণপরিষদ। ভবতোষ দেওয়ানকে সভাপতি, যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরাকে সহ সভাপতি ও প্রীতি কুমার চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক করে এই কমিটি গঠিত হয়।

এভাবে উপদলীয় কার্যকলাপ ক্রমান্বয়ে জোরদার হতে লাগলো। তার বহিঃপ্রকাশ হলো ১৯৮৩ সালের মাঝামাঝি। চক্রান্তকারীরা কেন্দ্রীয় অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ যখন সরিয়ে ফেলতে থাকে তখন ১৯৮৩ সালের ১৪ জুন কেন্দ্রীয় অনুগত বাহিনীর সাথে চক্রান্তকারীদের উস্কানিতে পানছড়ি থানার গোলকপদিমাছড়ার লাম্বাছড়ার উৎসমুখে এক সংঘর্ষ বাঁধে। এই সংঘর্ষে পার্টি অনুগত বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন মেজর সমীরন। সেই সংঘর্ষে অন্যতম সামরিক প্রশিক্ষক ও বিভেদপন্থীদের পক্ষাবলম্বনকারী অমৃত লাল চাকমা ওরফে বলি ওস্তাদসহ অনেকে নিহত হন। এই যুদ্ধে বিভেদপন্থীদের কেন্দ্র আক্রমণের পরিকল্পনা বানচাল হয়। ত্রিভঙ্গিল দেওয়ান সেসময় কেন্দ্র আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন। এভাবে গৃহযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠে। ১৪ জুনের ঘটনার পর জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে ২৫ আগস্ট ১৯৮৩ তারিখে ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। পার্টির সভাপতি এই সময়ে দৃঢ়তার সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করে যেতে থাকেন। তাঁর দৃঢ়তা, ধৈর্য, সাহস, মহানুভবতা ও ক্ষমাশীলতায় এই গৃহযুদ্ধ অবসান করানোর উদ্যোগ নেয়া হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুর্নীতিবাজ, প্রতিক্রিয়াশীল, ক্ষমতালোভী, দ্রুত নিষ্পত্তিবাদীরা তাদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার প্রয়াসে পার্টির গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ চূড়ান্তভাবে লঙ্ঘন করলো। গৃহযুদ্ধ চলতে থাকে।

জুম্ম জাতির বৃহত্তর স্বার্থে পার্টির সভাপতি এম এন লারমা বিভেদপন্থী উপদলীয় চক্রান্তকারীদেরকে পুনরায় বৈঠকে বসার জন্য আহ্বান জানালেন। এই ক্ষমা ঘোষণায় তিনি তাঁর মহানুভবতার ও ক্ষমাশীলতার এক নজির স্থাপন করে জাতীয় ইতিহাসে মহান নেতার পরিচয়ে আরেকবার স্বাক্ষর রাখলেন। এম এন লারমার সভাপতিত্বে ১৯৮৩ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত বিভেদপন্থীদের সাথে উচ্চপর্যায়ের এক বৈঠক বসে। সেই বৈঠকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন তথা জুম্ম জাতির মহান স্বার্থে গণতন্ত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে 'ভুলে যাওয়া ও ক্ষমা করা' নীতির ভিত্তিতে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এই নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্বক স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া অনতিবিলম্বে পরস্পরে আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ বন্ধ করা, আটকাধীন সদস্যদেরকে সসম্মানে মুক্তি প্রদান, বিভেদপন্থীদের থেকে দখলকৃত অবৈধ ও গোপনীয় দলিলপত্র ও নীল-নকশা নষ্ট করাসহ পুনর্মিলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বস্তুত উক্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছুদূর অগ্রগতিও সাধিত হয়। অস্ত্র সংবরণ ও বন্দী সদস্যদের মুক্তিও দেয়া হয়, আর পুনর্মিলনের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে যোগাযোগও হতে থাকে। সারাদেশেও কর্মী বাহিনীতে একটা শান্তি ও স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি হতে থাকে। পার্টির সর্বস্তরে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধানের একটা মানসিক অবস্থা ও পরিবেশ বিরাজ করতে থাকে। কর্মীবাহিনীর মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে। সবাই হাতে হাত মিলালো। শুকর কেটে একসাথে খাওয়া-দাওয়া করলো। কর্মীবাহিনী খুশীতে আত্মহারা হয়ে উঠে। আগের মতো এবার শুরু হবে অধিকতর দুর্বার আন্দোলন।

কিন্তু জুম্ম জাতীয় কুলাঙ্গার, উচ্চাভিষাষী ও ক্ষমতালোভী চক্রান্তকারী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র জাতীয় স্বার্থের সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গুপ্তচর ও দালালদের উস্কানীতে উচ্চ পর্যায়ের গৃহীত সিদ্ধান্তের কালি

শুকোতে না শুকোতে ১০ই নভেম্বর ১৯৮৩ সালে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে এক অতর্কিত সশস্ত্র হামলায় আটজন সহযোদ্ধাসহপ্রিয় নেতা এম এন লারমাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ১০ নভেম্বর ভোর আনুমানিক পৌনে ৩টার দিকে অর্থাৎ ৯ নভেম্বরের দিবাগত রাত পৌনে ৩টার দিকে নরপিশাচ সুখেন্দু বিকাশ চাকমা এলিন (কম্যান্ডার) ও অংচিং প্রু মারমা এমং (সেকেন্ড কম্যান্ডার) এর নেতৃত্বে বিভেদপন্থীরা আক্রমণ করে। এভাবে জুম্ম জাতি ভাগ্যাকাশে সবেচেয়ে উজ্জল নক্ষত্রের জীবনাবসান হলো। সেই পাশবিক আক্রমণে মহান নেতা এম এন লারমার সাথে শহীদ হয়েছিলেন মেজর পরিমল বিকাশ চাকমা (রিপন); পানছড়ি পিআরসি'র প্রথম সম্পাদক শুভেন্দু প্রভাস লারমা (তুফান); গ্রাম পঞ্চায়েত বিভাগের সহকারি পরিচালক অপর্ণা চরণ চাকমা (সৈকত); সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট অমর কান্তি চাকমা (মিশুক); উদীয়মান কর্মী মনিময় দেওয়ান (স্বাগত); ডাক্তার কল্যাণময় খীসা (জুনি); সন্তোষময় চাকমা (সৌমিত্র) ও লেন্স কর্পোরেল অর্জন ত্রিপুরা (অর্জুন)। ১০ই নভেম্বরের ঘটনার ফলে গৃহযুদ্ধ এক মারাত্মক পরিস্থিতির দিকে মোড় নেয়।

সেদিনের লোমহর্ষক ঘটনায় সন্তোষময় চাকমা সৌমিত্র আহত হওয়ার পর আরো দুইদিন বেঁচে ছিলেন। বিভেদপন্থী হায়েনাদের উপর্যপরি ব্রাশ ফায়ারে গুরুতর আহত হয়ে তিনি মহান নেতার জায়গা থেকে সামান্য দূরে এক ঝোপে আড়াল করা গর্তে নিজিকে কোন মতে বাঁচিয়ে রাখেন। তাঁর প্রত্যক্ষ বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এম এন লারমা প্রথমে পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়। তিনি কয়েকদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। তাই অসুস্থ শরীর ও দুর্বলতা হেতু তিনি সরে যেতে পারেননি। শত্রুরা ব্যারাকের ভেতরে ঢুকে এম এন লারমাকে আহত অবস্থায় দেখতে পায়। তখন এম এন লারমা আক্রমণকারীদের সাথে কথা বলার সুযোগ পান। এম এন লারমা প্রথম বলেছিলেন, 'কি, তোমাদেরকে ক্ষমা করে আমরা কি অন্যায় করেছি? আমাকে কিংবা তোমাদের বন্ধুদের মেরে জাতি কি মুক্ত হবে? যাক, তোমরা প্ররোচিত ও উত্তেজিত হয়ে যাই করো না কেন জাতির দুর্দশাকে তোমরা কখনো ভুলে যেও না। আর জাতির এ আন্দোলনকে কখনো বানচাল হতে দিও না।' এম এন লারমার কথা শুনে উপস্থিত দুইজন শত্রু নীরবে চলে যায়, তারা আর ফিরে আসেনি। ততক্ষণে তাদের মধ্যে কড়া ভাষায় কথা কাটাকাটি হতে শোনেন আহত সৌমিত্র। সন্ত্রস্ত কণ্ঠে 'ও যেদং ভিলে যেদং' (যেতে বলছে, চল যাই) একজনকে বলতে শুনেছিলেন তিনি। সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎগতিতে কে একজন এসে মহান নেতা এম এন লারমার গায়ের উপর উঠে কোন কথা না বলে ব্রাশ ফায়ার করে দ্রুত পালিয়ে যায়।

যিনি জুম্ম জাতির জাতীয় চেতনার উন্মেষ সাধন করেছিলেন, যিনি জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের লক্ষ্যে কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণের মহান পার্টি–জনসংহতি সমিতি গঠন করেছিলেন, যাঁর পতাকাতলে জুম্ম জাতীয়তাবাদী আদর্শে ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে মহান আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার গড়ে তুলেছিলেন, যাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতায় জুম্ম জাতি ধ্বংসের মুখোমুখী হয়েও আজো টিকে আছে, সেই মহান চিন্তাবিদ ও রাজনীতিবিদ এম এন লারমার অকাল মৃত্যুতে সমস্ত পার্টি, শান্তিবাহিনী তথা জুম্ম জনগণের মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্বের যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা সহজে পূরণ হবার নয়। জুম্ম জাতির কর্ণধার, মহান দেশপ্রেমিক এম এন লারমার অবদান জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রাম তথা বিশ্বের নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের সংগ্রামে চিরস্মরণীয় ও চির দেদীপ্যমান হয়ে থাকবে। তাঁর প্রদর্শিত পথ ও নির্দেশিত নীতি-কৌশল আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রামে একমাত্র দিশারী হয়ে থাকবে। মহান নেতার আত্মত্যাগ ও তিতিক্ষা হবে যুগে যুগে দেশে দেশে প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষের জলন্ত অনুপ্রেরণার উৎসস্থল।

১০ নভেম্বরের নৃশংস ঘটনার পর ১৯শে নভেম্বর কেন্দ্রীয় কমিটির জরুরী বৈঠকে পার্টির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমাকে নির্বাচিত করা হয় এবং বিভেদপন্থীদের উচ্ছেদ করতে Dissident Destruction Force নামে বিশেষ বাহিনী (ডিডিএফ) গঠন করা হয়। যুদ্ধক্ষেত্রের বিস্তৃতি, বিভেদপন্থীদের অবস্থান ও শক্তি প্রভৃতি বিবেচনায় এনে ডিডিএফ'কে কোবরা, লায়ন ও টাইগার নামে তিনটি ইউনিটে বিভক্ত করা হয় এবং তাদের অভিযানের এলাকা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়।

৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৩ সালে জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে 'জুম্ম জাতির জাতীয় চেতনা ও জাগরণের অগ্রদূত, পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে হত্যা করার পরিপ্রেক্ষিতে জনসংহতি সমিতির বিবৃতি' প্রকাশ করা হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, 'রাতারাতি দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার দিবাস্বপ্ন দেখে দ্রুত নিষ্পত্তির নামে আজ জুম্ম জাাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনে কি নিদারুণ আঘাত তারা হানলো আর জাতীয় বিশ্বাসঘাতক এই চতুঃচক্রী গৃহযুদ্ধ শুরু করে দিয়ে ও এক সপ্তাহের রাজত্ব কায়েম করে জুম্ম জনগণকে কি নিশ্চয়তার গহ্বরে নিক্ষেপ করলো।' বিবৃতিতে আরো বলা হয়, 'আজ সমগ্র পার্টি তথা জুম্ম জনতা এক চরম সংকটের মুখোমুখী। একদিকে গৃহযুদ্ধ অন্যদিকে বাংলাদেশ সরকারের দুরভিসন্ধিমূলক সামরিক ও বেসামরিক কার্যক্রম। সেইসাথে দেশী-বিদেশী রাজনৈতিক গুপ্তচর ও দালালদের গতিবিধি ও কর্মতৎপরতা। এমতাবস্থায় একমাত্র পার্টি ও

জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তিই এই চরম সংকট মোকাবিলা করতে সক্ষম।' তাই পার্টির কর্ণধার প্রিয় নেতাকে হারানোর শোকে আর শোকাতুর অবস্থায় হতাশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দোলায়িত না হয়ে আবারো সম্মিলিতভাবে আত্মমুখী প্রস্তুতি জোরদার করতে এবং কঠোর বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করে পার্টি ও জনগণের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে, সম্মিলিতভাবে বিশ্বাসঘাতক, প্রবঞ্চক, মীরজাফরের গোষ্ঠী– গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিয়ে অচিরেই গৃহযুদ্ধের অবসান করে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রাম জোরদার করতে পার্টির পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়।

এরপর ৩১ জানুয়ারি ১৯৮৪ সালে জনসংহতি সমিতি গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র দ্বারা বিপথে পরিচালিত সংগ্রামী ও দেশপ্রেমিক সদস্যগণের প্রতি জরুরি ঘোষণা জানিয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করে। বিবৃতিতে আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, 'আর দেরি না করে আপনারা পুনরায় পার্টিতে যোগ দিন। পার্টি আপনাদের ক্ষমা প্রদর্শন করবে। ইতিপূর্বেও পার্টি আপনাদের ক্ষমা ঘোষণা করেছিল। ...সর্বপ্রকারের বিভেদ ভুলে গিয়ে ও ক্ষমাশীল মনোভাব নিয়ে আপনারা ফিরে আসুন। জাতীয় সম্পত্তি অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ বিভেদপন্থীদের থেকে ছিনিয়ে আনুন। আপনাদের পূর্ণ নিরাপত্তাসহ যথাযোগ্য মর্যাদায় পার্টি পুনরায় আপনাদের দায়িত্ব প্রদানের পূর্ণ গ্যারান্টি ঘোষণা করছে।'

বিভেদপন্থীদের বিশ্বাসঘাতকতামূলক সশস্ত্র আক্রমণে মহান নেতা এম এন লারমাকে নৃশংস হত্যার পর গর্জে উঠে জুম্ম জনতা, ধিক্কার দেয় সেই নরাধমদের। পার্টির কর্মী ও সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরাও ক্ষত বাঘের মতই হুঙ্কার দিয়ে উঠে আর হয়ে উঠে ক্ষমাহীন। পার্টি ও জনগণ আবারো একই কাতারে দাঁড়িয়ে এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন প্রতিঘাত দিতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠে। জোরালো হয়ে উঠলো নির্মম নির্দয় গৃহযুদ্ধ। যে সমস্ত অঞ্চলে গৃহযুদ্ধের দাবানলে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই সমস্ত এলাকায় জনগণকে সইতে হয়েছিল অবর্ণনীয় অনেক দুঃখকষ্ট। সর্বশেষ ১৯৮৫ সালের ২১ জানুয়ারি পানছড়ির গোলকপতিমা এলাকায় এক যুদ্ধে বিভেদপন্থীদের শোচনীয় পরাজয়ে তাদের মনোবল একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে। ১৯৮৪ সালের মধ্য-মার্চে 'ডেঞ্জারাস্ অপারেশন গোলকপুদিমা' (ডগ) নামে অভিযান চালানো হয়। শান্তিবাহিনীর ১৬৫ জন সদস্যের ৪টি দলে বিভক্ত হয়ে এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। ৮/১০ দিন ধরে একনাগারে কৌশলগত ও সশস্ত্র আক্রমণের ফলে বিভেদপন্থীদের মনোবল একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে। একপর্যায়ে প্রাণের ভয়ে দ্রুত পাততাড়ি গুটিয়ে দক্ষিণ দিকে পালিয়ে যেতে থাকে। ডিডিএফের সদস্যরা বিভেদপন্থীদেরকে নান্যাচরের জগনাতলী পর্যন্ত ধাওয়া করে। ১৯৮৫ সালের ১৩ এপ্রিল ফুলবিঝুর দিনে নান্যাচরের ঝোরবো মহাজন পাড়ায় (তৈচাকমা ছড়ার থুম) বিভেদপন্থীদের উপর সর্বশেষ আক্রমণ করে ডিডিএফ সদস্যরা। ফলে ফুরামোন-তেঙাছড়ি মোনের রেঞ্জ অতিক্রম করে বিভেদপন্থীরা প্রাণের তাগিদে কাউখালী এলাকায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

উল্লেখ্য যে, ডিডিএফের একের পর এক আক্রমণে কোণঠাসা হয়ে পড়লে বিভেদপন্থীদের সশস্ত্র বাহিনী সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ করে। এই যোগাযোগের সূত্র ধরে সেনাবাহিনীর সাথে বিভেদপন্থীদের প্রথম গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৪ সালের ১ জুন। তারই ধারাবাহিকতায়, অপরদিকে পার্টি অনুগত সদস্যদের ক্রমাগত আক্রমনে সর্বশেষ কাউখালীতে আশ্রয় নেয়ার পর ১৯৮৫ সালের ১৮-১৯ এপ্রিল সর্বশেষ নবম বৈঠক হয় চট্টগ্রাম সেনানিবাসে। সেখানে সেনাবাহিনীর কাছে বিভেদপন্থীদের আত্মসমর্পণের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। যে বিভেদপন্থীরা পার্টিকে আপোষপন্থী বলে নিন্দা করতো, যারা নিজেদেরকে দাবি করতো নিখাঁদ দেশপ্রেমিক বলে, সেই বিভেদপন্থীরা ১৯৮৫ সালের ২৯ এপ্রিল রাঙ্গামাটি স্টেডিয়ামে শত শত জনতার সামনে অতি নির্লজ্জভাবে শত্রুর কাছে সশস্ত্রভাবে আত্মসমর্পণ করে। সেদিন হরিকিস্ট চাকমা বিদ্যুতের নেতৃত্বে গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের ২৩৩ জন সদস্য আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণকারী ২৩৩ জনের মধ্যে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বিভেদপন্থী চক্রান্তকারী ছিলেন নিশিধন চাকমা পিয়র, শান্তিময় চাকমা জয়েস, প্রসন্ন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা দুর্জয়, অতুল চন্দ্র তালুকদার রোমেল এবং সুখেন্দু বিকাশ চাকমা এলিন। বিভেদপন্থীরা 'গ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক ও ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল এম নূর উদ্দিন খান, পিএসসি-এর নিকট অস্ত্র সমর্পণ করেন। তার মধ্য দিয়ে বিভেদপন্থীদের চক্রান্ত তথা অনাকাঙ্ক্ষিত গৃহযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

নির্মম এই গৃহযুদ্ধে শান্তিবাহিনীর ভূমিকা ছিল অপরিমেয় গুরুত্বপূর্ণ। তাদের আনুগত্য ছিল নিষ্কলুষ, সংগ্রামী দৃঢ়তায় ছিল অটল। পার্টির সম্মুখে দুর্ভেদ্য যে বাধা তা দূরীভূত করতে এই সশস্ত্র বাহিনীই হয়েছিল আগুয়ান। কি করেনি এই বাহিনী? অহোরাত্র পরিশ্রম করে ঘর্মাক্ত দেহে, অভুক্ত পেটে হাতিয়ার আঁকড়ে ধরে ঘুমিয়েছিল। অন্ন নেই, শুধু ঢেঁকিশাক কাঁচা কলা আর কাঠাল খেয়ে তারা একদিকে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সাথে, অপরদিকে বিভেদপন্থী চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে লড়েছিল। তারা তোয়াক্কা করেনি শত্রুর ভৎসনা, পরোয়া করেনি শত্রুর আক্রমণ। তাদেরই তাজা রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল এই জন্মভূমি– শহীদদেরকে সসম্মানে দাফন করেছিল, শুশ্রূষা করেছিল আহতদেরকে। আহত যোদ্ধারা একটুখানি উপশম

পেয়ে আবার অস্ত্র হাতে নিয়ে দুর্বার বেগে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একই সাথে পালন করেছিল তারা। দজ্জালের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহসে আর মজলুমের প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টান্তে জাতির সম্মুখে তারাই বীর শ্রেষ্ঠ।

এই ক্ষয়িষ্ণু ও বিলুপ্তপ্রায় একটা জাতির ইতিহাসে শান্তিবাহিনীই প্রথম দেখিয়েছিল একই সঙ্গে দুই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দৃষ্টান্ত। দেখিয়েছিল বিভেদপন্থী ষড়যন্ত্রকারীদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার জ্বলন্ত উদাহরণ। তারা এমন একটি সশস্ত্র বাহিনী যারা নৈতিক মনোবলে বলীয়ান, কৌশলী ও বিচক্ষণ। যাদের মস্তকেই শোভা যায় গৃহযুদ্ধের সেই রক্তিম বিজয় মুকুট। তারা শত্রুর চোখে যেমনি যম, তেমনি বন্ধুর চোখে করুণার আলো। পার্টির নৈতিক শিক্ষা, আর নিপীড়িত জনগণের অকৃত্রিম ভালবাসাই কর্মীবাহিনীকে এই গৃহযুদ্ধের এক রক্তাক্ত নদী পার হতে প্রচন্ড সাহস ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।

গৃহযুদ্ধের কারণে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা অপূরণীয়। তবুও ফলাফলে দেখা নীতিগতভাবে পার্টি অনেক উপকৃত হয়েছে। যদিও জাতীয় চেতনার অগ্রদূত, জাতির কর্ণধার ও পার্টি প্রতিষ্ঠাতা এম এন লারমাকে চিরতরে হারিয়েছে, হারিয়েছে অনেক বীব বিপ্লবী সহযোদ্ধাকে, তথাপি দলের অভ্যন্তরে যে সুবিধাবাদ এতদিন বিরাজ করছিল, তা মূলচ্ছেদ হয়েছিল। দলের ভেতরকার এসব সুবিধাবাদী বিভেদপন্থীদের বিতাড়নের ফলে দল আগের চেয়ে আরো বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। জুম্ম জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার মতবাদের মহান গুরু এম এন লারমা যে শিক্ষাদান করেছিলেন তারই প্রত্যক্ষ ও অব্যবহিত অনুবর্তন হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) এম এন লারমার মৃত্যুর পর পার্টির দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। প্রয়াত নেতার জীবদ্দশায় তিনি দীর্ঘদিন দোহারের কাজ করেছিলেন– কাজেই দুই নেতার জীবন সাধনা হয়ে উঠেছিল সাধারণ ও পারস্পারিক। জনগণের ভাষায়– 'দুই সহোদরের মধ্যে বড় ভাইটি হচ্ছেন সৃষ্টিশীল ও উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী, আর ছোট ভাইটি হচ্ছেন ইমারত শিল্পী। বস্তুত পক্ষে জনসংহতি সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রথমার্থে সংগঠনের মাধ্যমে যিনি জনগণের প্রকৃত লৌহ প্রাকার গড়ে ছিলেন এবং সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামব্যাপী গেরিলা ঘাঁটি এলাকা ও পার্টির অঙ্গসংগঠনসমূহের প্রতিষ্ঠা ও সংগঠিত করার ক্ষেত্রে যিনি সর্বাধিক কৃতিত্বের দাবিদার তিনি হচ্ছেন সন্তু লারমা। একমাত্র তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে শান্তিবাহিনী জন্মলাভ করে দ্রুত গতিতে শক্তি সঞ্চয় করেছিল।

একথা অত্যন্ত বাস্তব সত্য যে, ছাত্রজীবন থেকে যাঁর রাজনৈতিক অঙ্গণে হাতেখড়ি– তিনি সন্তু লারমাই একমাত্র ব্যক্তি যিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল– মধু রেমাক্রি থেকে মাইনি, কাচলং, দুরুং-সত্তা হয়ে ফেনী, লোগাং পুজগাং পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় আপামর জুম্ম জনগণের দুঃখদুর্দশা প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জাতির নেতা ও দুঃখী মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। সর্বোপরি দৈনন্দিন জীবনের অভাব অনটন থেকে শুরু করে শত্রুর হাতে বন্দী হয়ে নির্মম ও নিষ্ঠুর নির্যাতন সহ্য করার যার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে। তিনিই সেই একনিষ্ট বিপ্লবী সন্তু লারমা যিনি ১০ই নভেম্বরের সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ও বেদনাদায়ক দিনেও সুমেরুর মত অটল থেকে পার্টিকে সঠিক পথে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রথম রুখে দাঁড়িয়ে গৃহযুদ্ধের বিজয় মুকুট ছিনিয়ে এনেছিলেন। জটিল গৃহযুদ্ধের সময়েও তিনি যে সমস্ত সাহসী ও বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সে সবের সফলভাবে কার্যকরী হওয়াতে পার্টিতে নিরঙ্কুশ নেতৃত্ব গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সমগ্র পার্টিকে নতুন করে নিবিড় ও কঠিন ঐক্যে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন।

> গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের উত্তরণ হবে আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশে। ...আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র হবে, দেশে অভাব থাকবে না, হাহাকার থাকবে না, মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ থাকবে না, হিংসা, দ্বেষ, বিদ্বেষ—কিছুই থাকবে না। শুধু থাকবে মানুষে মানুষে প্রেম, প্রীতি, মায়া, মমতা এবং তার দ্বারা এক নতুন সমাজ গড়ে উঠবে। মানবতার এই ইতিহাস থাকবে এবং তাতে লেখা থাকবে 'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই'। আমি আজ কামনা করি, তাই হোক।
>
> *সংবিধান-বিলের উপর ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে এম এন লারমার গণপরিষদে প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ*

মঞ্জুকে দেখেছি

ডা: ভগদত্ত খীসা

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি হয়েছে বছর কেটে গেছে। আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আদায়ের দৃপ্ত শপথ নিয়ে যারা ছিল বনে জঙ্গলে সংগ্রামরত, স্বদেশে উৎপীড়ন আশঙ্কায় যারা ছিল ভিনদেশে পলাতক- শরণার্থী তারা অনেকেই ফিরেছে ঘরে। কিন্তু যে ছিল এই অঘটন পটিয়সীর মহানায়ক, সে এই দলে নেই। আজ থেকে পনের বছর আগে তার দেহাবসান হয়েছে। অন্তর্দলীয় কোন্দলের অতর্কিত এক হামলায় নৃশংসভাবে নিহত হয়েছে সে। ফিরে এলো না ঘরে।

তার সহযোগী ও সহকর্মীরা সম্বর্ধনা সভায় বরমাল্য গলায় নিয়ে তুমুল করতালির ধ্বনিতে শিহরিত। তাদের মাঝে সে আর নেই। তাকে স্মরণ করে, দু'ফুটো অশ্রু ঝরবে আমাদের চোখে। শোক প্রস্তাব নেবে কেউ কেউ, সভায় সমবেত সবাই দাঁড়িয়ে এক মিনিট দু'মিনিট নীরবতা পালন করবে হয়ত। আমরা তাকে আর পাব না।

তাকে স্মরণ করে সভায় সমাবেশে কেউ বলবে মহানায়ক, কেউ বলবে জুম্ম জনগণের মুক্তির অগ্রদূত, সংগ্রামী চেতনার ভাস্বর। কেউ আখ্যায়াত করবে মাওবাদী কমিউনিস্ট। শত্রুরা বলবে বিপথগামী আত্মভোলা পথিক। তাকে ঘিরে আমার হাজারো প্রশ্ন। সাক্ষাতে জবাব পেয়েছি সামান্য। শেষ প্রশ্ন এখনো আছে মনে। শেষ উত্তর পাওয়ার আর কোন অবকাশ নেই।

> ভাষণে ও চিন্তনে মানুষটি অনাড়ম্বর নয়। জাতির স্বপক্ষে পার্লামেন্টে প্রদত্ত তার বক্তৃতামালা প্রমাণ করবে কি জোরালো এবং যুক্তিপূর্ণ তার ভাষণ। মঞ্জু কথা বলত কম, কিন্তু চিন্তা-চেতনায় ভাস্বর তার অন্তঃস্থল।

এই মহানায়ক মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। ডাক নাম মঞ্জু। আমি তাকে মঞ্জু বলি। সে আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন আপনজন। আমি গর্বিত তার রক্ত আমার সন্তানের শিরায় ভীমবেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। আমার সহধর্মিনীর জেষ্ঠ্যতো বোন সুভাষিনী দেওয়ান তার মা। রক্তের সম্পর্ক সেখানে। সে আমাকে মেসোবাবু ডাকে। আমি ডাকি মঞ্জু।

বড় পুণ্যবতী মহিলা তার মা। সারা জীবন অতিথি সৎকারে কেটে গেছে। রাঙ্গামাটি থেকে বার মাইল দূরে মহাপ্রুম গ্রাম। সেখানে তাদের বাড়ি। সে সময় গাড়ি-টারি ছিল না। চলতে হয় হাঁটাপথে। রাঙ্গামাটি হেডকোয়ার্টার থেকে কোম্পানীর রাস্তা এঁতে চলে গেছে প্রত্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে। ভোরবেলা রওনা দিলে মহাপ্রুম পৌঁছতে বেলা পড়ে, গাঁয়ের কোন এক গৃহে আতিথ্য নিয়ে বলতে হয়, দুটো খেতে হবে। গৃহিণী তড়িঘড়ি দু'মুঠো ব্যবস্থা করেন। তাই খেয়ে আবার পথ চলা।

কথায় বলে, অতিথি নারায়ণ। তাই যদি হয়, এই নারায়ণ সেবা করে সুভাষিনী দেবী পুণ্য সঞ্চয় করে নিশ্চয় স্বর্গবাসীনী হয়েছেন।

বাবা চিত্ত কিশোর চাকমা। বড় সাধাসিধে মানুষ। সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে তখন ছয়টি মধ্য ইংরেজি স্কুল ছিল। ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়া যেত। মহাপ্রুম মধ্য ইংরেজি স্কুল তার মধ্যে অন্যতম। সেই স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন তিনি।

হাঁটু পর্যন্ত পরা ধূতি। আর একটা জামা। ঘরে পরতেন বেনিয়ান। খুবই কর্মঠ মানুষ। নিজের পেশায় একনিষ্ঠ। ছাত্রদের পড়াতেন আর শিক্ষা দিতেন। বিলাসবিহীন জীবন। তৈলাক্ত মাথায় টেরিকাটা দেখলে কাছে ডেকে বলতেন, 'জোয়ান হয়েছে তাই না? মাথায় হাত বুলিয়ে চালিয়ে চুলের ভাজই ভেঙে দিতেন।

তিনি 'লারমা' পদবী সৃষ্টি করেছিলেন। ইংরেজরা এদেশে আসার আগে ট্রাইবাল লোকেরা কেউ চাকমা, মারমা পদবী ব্যবহার করত না। নাম জিজ্ঞেস করলে কেবল নামটাই বলত। ভিন্ন ভিন্ন ট্রাইবাল গোষ্ঠীবর্গ চিহ্নিত করার কাজ জন্য সাহেবরা চাকমা, লুসাই, মগ (মারমা) ইদ্যাদি নামের শেষে জুড়ে দিত। চিত্ত কিশোর বাবু বলতেন, কই হিন্দু মুসলমানেরা তো নামের শেষে অমুক হিন্দু, দমুক মুসলমান লিখে না। তাই তার ইচ্ছা চাকমাদের 'গোজা' ভিত্তিক পদবী হওয়া দরকার। লারমা গোজাভূক্ত লোকেরা নামের শেষে লারমা পদবী জুড়ে দেবে। এই নতুন পদবী তিনি নিজেও লিখতেন এবং ছেলেদের নামের শেষাংশে জুড়ো দিয়েছেন। এই হলেন মঞ্জুর বাবা-মা।

মঞ্জু ও তার বড় ভাই বুলুকে দেখেছি ওরা যখন ছোট। সেই মহাপ্রুম গ্রামে। কোম্পানীর রাস্তার পাশে বাড়ির আঙিনায় হাফপ্যান্ট পরে খেলত। এই রাস্তা যাতায়াতের সময় প্রায় নজরে আসত দুই ভাইকে।

সুদীর্ঘকাল পরে ও যখন বড় হল, চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র, থাকত ১৬নং ব্যান্ডেল রোডের পাহাড়ি ছাত্রাবাসে। আমার তখন বিয়ে হয়েছে। আত্মীয়তার সুবাদে আমি হলাম তার মেসোবাবু এবং আমি ডাকতাম মঞ্জু। ঢাকা থেকে বাড়ি আসা-যাওয়ার পথে ছাত্রাবাসে বিশ্রাম নিতাম। কুশল বিনিময় হত। বড় নিরীহ মনে হত তাকে।

ডাক্তারী পাশ করে চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালে যখন ইন্টার্নি করতে আসি, আমাকে থাকতে হল সেই ক্যান্ডেললাইটিং রোডের ছাত্রাবাসে। দেখেছি তার কক্ষটি শূন্য, খাট বিছানা খালি। এভাবে পড়েছিল দীর্ঘদিন। সে নেই।

মঞ্জু পড়াশুনা করত প্রচুর। মার্কস, এঙ্গেলস, লেলিন, স্টালিন। মাও সেতুং তার প্রিয়। পড়ত চীনা ও রাশিয়ান সাহিত্য। এ সময় কর্ণফুলির কাপ্তাই বাঁধের ফলে হাজার হাজার মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে গেল। ঘর-বাড়ি, জমি-জমা পানিতে তলিয়ে গেল। তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপুরণ দেওয়া হয়নি। ব্যবস্থা করা হয়নি যথাযোগ্য পুনর্বাসন। এই অভিযোগ নিয়ে একটা ইস্তাহার প্রকাশ করল মঞ্জু। পুলিশের টনক নড়ল। অচিরেই তাকে কারারুদ্ধ করা হল। সে রাজবন্দী। বন্দীদশায় পাশ করছে বিএ এবং পরে এল.এল.বি।

বছর গড়িয়ে গেল আরো। বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সে শিক্ষকতার পেশায় আত্মনিয়োগ করেছিল। খাগড়াছড়ি জেলায় পর পর কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং অবসর সময়ে সহযোগীদের নিয়ে ভবিষ্যত সংগঠনের পরিকল্পনা করে যাচ্ছিল। তারই ফসল জনসংহতি সমিতি। প্রতীক ছিল মিটমিট করে জ্বলা সলিতা সম্বলিত মাটির প্রদীপ। আলাদীনের চেরাগের মত এটাই জুম্ম জনগোষ্ঠীর আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে শান্তি-সুখ চুক্তির যাবতীয় নীতিমালা ও বিধিবিধান বাস্তবায়িত করেছিল। এই চেরাগের পিছনে দৈত্য যে যাবতীয় কর্মযজ্ঞের হোতা- মঞ্জু নিজেই।

তারপর এল পূর্ব পাকিস্তানের সেই জনজোয়ার। শেখ মুজিবের ডাকে বাঙালিরা এক যোগে ভোট দিয়েছিল আওয়ামীলীগকে পূর্ব পাকিস্তানের শেষ নির্বাচনে। ব্যতিক্রম পার্বত্য চট্টগ্রামের দুটি আসন। এখানে মঞ্জুর জনসংহতি সমিতির প্রতীক মাটির প্রদীপ জিতেছে দুই আসনেই। তার একটিতে অবশ্যই মঞ্জু।

মঞ্জু তখন এম.পি। থাকত জেল-রোডের শেষ প্রান্তে একটি বাড়িতে। অসুখে-বিসুখে প্রায় আমার ডাক পড়ত সেখানে। দেখতাম মঞ্জু বাপের ধাতই পেয়েছে। অনাড়ম্বর জীবন। বৈঠকখানায় একটা তক্তপোশ পাতা। একটা হাতলওয়ালা চেয়ার এবং গোটা দুয়েক টুল। শীতল পাটি মেঝেতে পেতে তোষকের শয্যায় ভূমিতে শয়ন। প্রেসক্রিপশন লেখার পর আমাকে খাওয়ায় বেলের শরবত অথবা পাকা কাঁঠাল বা ওভালটিন হরলিকস। চিরাচরিত চা বিস্কুট নয়।

ভাষণে ও চিন্তনে মানুষটি অনাড়ম্বর নয়। জাতির স্বপক্ষে পার্লামেন্টে প্রদত্ত তার বক্তৃতামালা প্রমাণ করবে কি জোরালো এবং যুক্তিপূর্ণ তার ভাষণ। মঞ্জু কথা বলত কম, কিন্তু চিন্তা-চেতনায় ভাস্বর তার অন্তঃস্থল। কথার ফাঁকে ফাঁকে বুঝতাম তলে তলে কিছু একটা হচ্ছে কিন্তু তার মনের থই পেতাম না। নিরিবিলিতে আলাপ করব এই বুদ্ধি করে তাকে দু'বার আমার বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলাম। সন্ধ্যা হতে না হতেই একজন সঙ্গী নিয়ে আসত সে। তখনই খাবার খেয়ে চলে যেত সাত তাড়াতাড়ি। কথা বলার কোন অবকাশ দিত না। দ্বিতীয়বার আহার পর্ব শেষে মঞ্জু বলেছিল, 'মেসোবাবু, আপনি বোধ হয় কিছু জানতে আগ্রহী। এখন কিছু বলা যাবে না। হাজারো কথা জমে আছে। ভবিষ্যতে আলাপ করব।'

সেই ভবিষ্যত এল না। সে চলে গেল, তাকে ওরা বাঁচতে দিল না।

মঞ্জু ওকালতি পাশ। রাজনীতি করতেই দিন কাবার। তবু তার ওকালতি দেখার সুযোগ একবার হয়েছিল।

সেবার চারু বিকাশ চাকমা আমাদের আর একনেতা, বেজায় ফ্যাসাদে পড়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা। সুবলং বাজারে জনাকয়েক আততায়ী হঠাৎ গুলি-গোলা শুরু করল। পুলিশ ব্যাটালিয়নের যারা ছিল, তারাও ফায়ারিং শুরু করল। ঠিক সেই সময় চারু বাবু স্পীড্ বোটে করে মাইনিমুখ যাচ্ছিলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে তিনি বোট থামিয়ে নদীর পাড়ে নিরাপদ আশ্রয় নিলেন। আততায়ীরা পালানোর পর পুলিশ তাঁকে খুঁজে বের করল নদীর পাড়ে।

পুলিশ তো খুশী। আসল নেতা ধরা পড়েছে। হৈ হৈ করে তাঁকে আনা হল রাঙ্গামাটিতে। তাঁকে করা হল কারাবন্দী। পরো পাহাড়ি ও বাঙালি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা প্রশাসনের কাছে আপত্তি জানালেন। আমাদের চারু বাবু এসব ঘটনায় জড়িত থাকবেন কল্পনাও করা যায় না। সেই মামলার শুনানি হল এস.ডি.ও'র কোর্টে। তখন রওফ সাহেব ছিলেন এস.ডি.ও। সেই শুনানিতে আমি উপস্থিত ছিলাম। তখন রাঙ্গামাটিতে কোন উকিল ছিল না। যা হোক মুঞ্জুতো এল.এল.বি পাশ উকিল। জামিনের আবেদনে তাকে ওকালতি করতে দেওয়া হল। এজলাসে অনেকক্ষণ যুক্তি-তর্ক দিয়ে বক্তব্য পেশ করল মঞ্জু। চারু বাবু জামিন পেলেন। আমার মনে হয় এটাই বোধ হয় তার জীবনের প্রথম ও সর্বশেষে ওকালতি।

শেখ মুজিবুরকে হত্যার পর গদী দখল করলেন খোন্দকার মুস্তাক আহমেদ। ক'দিন পর মঞ্জু একেবারে লা-পাত্তা। তার কোন খোঁজ খবর নেই। ঢাকা থেকে বোধ হয় কোন বার্তা এসে থাকবে। তখনকার ডি.সি সাহেব আব্দুল কাদের হন্য হয়ে খুঁজছিলেন। তিনি স্বয়ং আমার বাসায় গিয়ে হাজির। বললেন– 'ডাক্তার বাবু, তার খোঁজ করেন। আপনাকে নিয়ে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। যে কোন জায়গায়। জরুরি বার্তা আছে। আমার খবর আছে তিনি রাঙ্গামাটিতে কোথাও আছেন'।

সন্তু নেই। শান্তি বাহিনী নেতৃত্ব শূন্য হয়ে পড়েছিল। কাজেই মঞ্জুকে সেই নেতৃত্ব নেওয়ার জন্য পাড়ি দিতে হয়েছে অনিশ্চিত যাত্রায়।

মঞ্জু হারিয়ে গেল লোকচক্ষুর অন্তরালে। তার যোগ্য কর্মকৌশলতায় শান্তিবাহিনী আরো শক্তিশালী হয়ে উঠল। বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপে আমরা নিত্য উপলব্ধি করি তার হাতের ছোঁয়া। পরবর্তীকালে যুদ্ধে কলা-কৌশল নিয়ে দলে মতানৈক্য দেখা দিল। এর ফলাফল স্বরূপ তাকে জীবন দিতে হয়েছে হাতে গড়া কর্মীদের হাতে।

মঞ্জু আর আসবে না। সে যে নিভূ নিভূ মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছিল, সেই শিখাকে যথোপযুক্ত তৈল সিঞ্চনে সঞ্জীবিত করে চিরন্তন ধরে রাখা পরবর্তী প্রজন্মের দায়িত্ব। আমি আবেদন রাখব সেই দায়িত্বটুকু যেন তারা পালন করেন এবং বছরের অন্তত একবার তার মৃত্যু দিবস ১০ই নভেম্বর তাকে স্মরণ করেন।

বাঁ থেকে শুভেন্দু প্রভাস লারমা, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (১৯৫৩)

মহান নেতা এম এন লারমার সাথে শেষ দেখা

সত্যবীর দেওয়ান

১৯৮২ সাল। আমি তখন নানিয়াচর বন্ধুকভাঙ্গা এলাকার ১ম সম্পাদক এবং পাশাপাশি তৎকালীন এন জোনের রাজনৈতিক সচিব হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। সেপ্টেম্বর ১ম সপ্তাহে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের চিঠি পেলাম। চিঠিতে লেখা ছিল ২৪ সেপ্টেম্বর হতে ১ অক্টোবর ১৯৮২ পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী দ্বিতীয় জাতীয় মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। তাই কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যথাসময়ে প্রতিনিধিবৃন্দদের পৌঁছানোর কথা লেখা হয়েছে। ১৯৭৭ সালের ১ম মহাসম্মেলনের মত এবারও আমার আওতাধীন এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিবেদন লেখার প্রস্তুতি নিলাম। আর পাশাপাশি তৎকালীন সেক্টর কার্যালয়ের সথে যোগাগোগ করে সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিদলটির রওনা হওয়ার তারিখ জেনে নিলাম। তখন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের আউটপোস্ট ছিল বিশেষ সেক্টরের আওতাধীন 'পি জোন' এলাকায়। তাই সম্মেলনে যোগদানের জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি নেয়ার আনুষঙ্গিক কাজ ছেড়ে নেয়ার পদক্ষেপ নিলাম। তৎকালীন 'এন জোনের' কমান্ডার ছিলেন মহিন বাবু। তাঁকে অবশ্য প্রতিনিধি হিসাবে চিঠি দেয়া হয়নি। তাই তিনি এলাকায় থেকে গেলেন।

এরই মধ্যে 'এন জোনের' আওতাধীন আঞ্চলিক পরিচালক কর্মীদের সাথে বৈঠক করে উত্তর/দক্ষিণ উভয় অঞ্চলের সার্বিক অবস্থা জেনে নিলাম। আর আমি যথাসময়ে সেক্টর কার্যালয়ের নির্ধারিত আরভি-তে চলে এলাম, একে একে 'এল জোন', 'আরএম জোন', 'কেসি জোনের' প্রতিনিধিবৃন্দ আরভি-তে একত্রিত হলাম। তৎকালীন আমাদের ২নং সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন দেবংশী বাবু আর সেক্টর পলিটিক্যাল সেক্রেটারী ছিলেন তড়িৎ বাবু, সহকারি কমান্ডার তথা গ্রাপ বিভাগের সেক্টর পর্যায়ের পরিচালকের দায়িত্বরত তঞ্চঙ্গ্যা বাবু সহ অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ এক সঙ্গে নির্ধারিত তারিখে রওনা হলাম, প্রায় এক সপ্তাহ আগে। সামনে পিছনে সামরিক এস্কর্ট, প্রত্যেকের নিজস্ব রুখসেকে সাধারণত নিজস্ব ব্যবহারিক অদল-বদল পোশাক পরিচ্ছদ, রেক্সিন, মশারি, বেডসীট ও গিলাপ বা বুরগী কাপড়সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঙ্গে থাকে। এইভাবে মুভাছড়ি আগার তৎকালীন সেক্টর হেডকোয়ার্টার হতে সকাল বেলার খাবার খাওয়ার পর সামান্য বিশ্রাম নিয়ে রওনা দেয়া হয়। মুভাছড়ি হতে করল্যাছড়ি অনেক তাড়েং, কিজিং, শিলাময় পথ অতিক্রম করে প্রায় চারঘন্টা হাঁটার পর সন্ধ্যা নেমেছে, দাঁতকুপ্যা এলাকার জুমচাপে অবশেষে পৌঁছলাম। সেখানে জুমচাপের পাশাপাশি ৪টি ঘরে ভাতের ব্যবস্থা করা হলো। খাওয়া-দাওয়ার পর দুইটি জুমের ঘরে থাকার ব্যবস্থা করা হলো।

জুমের ঘরগুলো কাছাকাছি হওয়ায় রাত্রিকালিন সেন্ট্রি ডিউটি ও পাশওয়ার্ড ঠিক করা হলো। পরদিন ইটছড়ি, বেতছড়ি হয়ে কমলছড়ি আগা এলাকার জুমচাপে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা হলো। যেখানেই যাই না কেন সেখানেই দিবারাত্রি সেন্ট্রি ডিউটি প্রতিনিয়ত থাকতো। সেখানে বিকেলে রাতের খাবার খাওয়ার পর সেদিনের রাতেই বড় রাস্তা পার হতে হবে। কমলছড়ি হতে খাগড়াছড়ি-দীঘিনালার বড় রাস্তার বাউন্ডস সাধারণত যে দিকে ক্রশ করা হয় সেই দিকের অবস্থা জেনে নেওয়ার জন্য লোক নিয়োগ করা হয়। তাদের সহযোগিতায় বাউন্ডস ক্রশ করলাম। তারপর কমলছড়ি হতে আগত গণলাইনের লোকগুলোকে বিদায় দেওয়ার পর পরই আমরা অগ্রসর হই। সম্পূর্ণ রাস্তার টর্চলাইট জ্বালানো নিষিদ্ধ ছিল। শরৎ কালের মেঘমুক্ত আকাশ হওয়াই রাতের আকাশ চাঁদের ও তারকারাজির আলোতে রাস্তা চেনা যায়। এইভাবে একটির পর একটি গ্রাম অতিক্রম করে অবশেষে সম্মেলন শুরু হবার দুই দিন পূর্বে 'পি জোন' এলাকার কেন্দ্রীয় আউটপোস্টে সকাল প্রায় ৯ টায় পৌঁছলাম।

ঐ আউটপোস্টের কর্মীরা আমাদের স্বাগত জানালেন, সকলের সাথে করমর্দন শেষে বসতে দিলো, সঙ্গে পানীয় জলের ব্যবস্থা করলো। পাশাপাশি ধুমপায়ীদের জন্য দাবার (হুক্কা) ব্যবস্থাও। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার পর আবার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের 'ওপি'তে অবস্থানরত সদস্যদের একজন আমাদের নিয়ে চললো। প্রস্তরময় ছড়ার উজানে অনেক চড়াই উৎরাই, তারেঙ, কিজিং, পার হতে প্রায় এক ঘন্টা হাঁটার পর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পৌঁছলাম। সেখানে প্রহরারত সেন্ট্রি এগিয়ে এসে আমাদের স্বাগত জানালো। একে একে সবার সাথে করমর্দন করে নিজ সেন্ট্রি পোস্টে চলে গেলো আর ব্যারেকের অপর একজন সদস্য আমাদের নিয়ে চললো অতিথি আপ্যায়নশালায়। সেখানে বিছানো তেলপারের উপর সবাই একে একে বসে পড়লাম। সকল ঘরের চালা বাঁশের পাতায় নির্মিত। ঘরগুলি বাঁশের বেড়া রয়েছে তিন দিকে, একদিকে থাকে সম্পূর্ণ খোলা। কিছুক্ষণের মধ্যে পানীয় জলের ব্যবস্থা সহ হুক্কার ব্যবস্থা হলো। এরপর একে একে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ করমর্দন করে যার যার ব্যারাকে অবস্থান নিলেন।

সকাল তখন প্রায় সাড়ে ১১টা। তাই স্নান করে একেবারে পাকঘরে দুপুরে খাবার ছেড়ে আসতে হবে। প্রত্যেকের জন্য বরাদ্দ যার যার ব্যবহারের পানি আনার একেকটি ডুলুবাঁশের চৌঙ্গা আগেই তৈরি করে রাখা হয়েছে। খাবার পানির জন্য নিজস্ব কন্টেনার রয়েছে তাতে সেঁকে আনতে হয়। ব্যারেকের প্রায় সকলের খাওয়ার শেষ পর্যায়ে আমাদের জানানো হলো, 'আপনারা খেতে যেতে পারবেন', 'স্নান ছেড়ে একেবারে খানা পিনা ছেড়ে আসতে পারবেন' বলে জানিয়ে দেয়া হলো। যেই কথা সেই কাজ। তাই যার যার বাঁশের চৌঙ্গা নিয়ে ছড়ার কিনারে পাকঘরের দিকে রওয়ানা হলাম সবাই অর্থাৎ আমাদের সেক্টরের প্রতিনিধিবৃন্দ। কারণ পাহাড়ের একেবারে শীর্ষ চূড়ায় ব্যারাকের যাবতীয় ঘরগুলো। নিচে প্রায় ২৫০-৩০০ সিঁড়ি নামার পর তবেই পাকঘর। ব্যারাকের চারিধারে ঘনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। সূর্যের আলো দুপুর বেলায় ৩/৪ ঘন্টার মত থাকে, তারপর প্রায় দিনটা গাছবাঁশের ছায়ায় নির্মল শীতল হাওয়ার মধ্যে বেশ মনোরম পরিবেশ। স্নান শেষে দুপুরের খাবার খাওয়ার পর যার যার বাঁশের চৌঙ্গায় ঝর্ণার জল পুরে কলা পাতার ছিপি দিয়ে একে একে চৌঙ্গাটি কেউ পিটে বা কাঁধে নিয়ে ছড়ার পারের পাকঘর থেকে উপরে ব্যারাকে উঠে এলাম। জলভরা বাঁশের চৌঙ্গা রাখার স্থান যেখানে রয়েছে সেখানে রেখে যার যার নির্ধারিত বিশ্রামের স্থানে, নিজ নিজ রখসেক খুলে রেকসিন বিছানার চাদর বের করে বিছিয়ে রুখসেক হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিলাম। এরই মধ্যে অবশ্য দাবা ধুন্ড (হুক্কা ও তামাক) নিয়ে অতিথি আপ্যায়নের দায়িত্বরত এক সদস্য হাজির।

> “ সর্বশেষ আলাপে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আমাকে বলেছেন, মনে রাখবে, সামন্তরা হল ভীরু, তারা সংগ্রামবিমুখ, পরনির্ভরশীল, সুবিধাবাদী এবং আপোষমুখী। তবে তারা হিংস্র, তাই তাদের কাছ থেকে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে।

তারপর আর কি আমি তখন তামাক খাওয়ার জন্য উঠে পড়লাম। দাবা নিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ তামাক সেবন করে দাবাটি আর একজনকে দিয়ে আমি আমার লেখা সামগ্রিক প্রতিবেদনটি সাধারণ সম্পাদকের দপ্তরে গিয়ে দিয়ে আছি। ইতোমধ্যে প্রত্যেক সেক্টরের প্রতিনিধি পর্যবেক্ষকবৃন্দ এসেছেন সবার সাথে দেখাও হলো। সদস্যদের মধ্য হতে সাধারণ সম্পাদক দপ্তরের উদ্যোগে একটা সামগ্রিক পরিচালনা কমিটি গঠন করা হলো। ঐ সামগ্রিক পরিচালনা কমিটির বৈঠকের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন উপ-কমিটি যেমন– নিরাপত্তা, খাদ্য ও ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ, চিকিৎসা সহ অন্যান্য যাবতীয় উপ-কমিটি গঠন করার পর দায়িত্ব বন্টন হয়ে গেলো। পরবর্তীতে সম্মেলন যথাসময়ে শুরু হলো। সম্মেলন শুরু হলে প্রথম পর্যায়ে তিনজন বয়জ্যেষ্ঠ সদস্য যথাক্রমে সর্বশ্রী অফুরন্ত (নলিনী রঞ্জন চাকমা), নির্মল (যতিন্দ্রলাল ত্রিপুরা) এবং ক্যাহ্লাউ'কে সভাপতি হিসেবে নির্বাচন করা হয়। এই তিনজনের পালাক্রমে সভাপতিত্বে ৭ দিনব্যাপী সম্মেলন পরিচালিত হবে। সভাপতি মণ্ডলী নির্বাচনের পর বিগত দিনের বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের ফলে যেসব কর্মী বন্ধু শহীদ হয়েছেন তাদের স্মরণে এক মিনিট মৌনব্রত পালন করা হয়। তারপর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অবস্থার আলোকে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি এবং আন্দোলনের অবস্থা অনুযায়ী আমাদের করণীয় কি হতে পারে তার দিক নির্দেশনা স্বরূপ বিদায়ী কেন্দ্রীয় কমিটির সামগ্রিক প্রতিবেদন পাঠ করা হয়। এইভাবে সম্মেলন শুরু হলো। ঐ প্রতিবেদনের উপর আলোচনা শুরু হলো। তাতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সহ জুম্ম জনগণের আন্দোলনের রূপরেখা সহ যাবতীয় অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থা বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সর্বশেষে বর্তমান ও ভবিষ্যতের করণীয় কি হতে পারে সেসব বিষয় যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

আমরা ২নং সেক্টর থেকে আসার পথে লোকের মুখে ও কর্মীদের মুখে বিশেষ সেক্টর এলাকায় পৌঁছার পরপরই নানা প্রকার গুঞ্জন শুনেছি। কিন্তু কোন মন্তব্য করিনি। বলতে গেলে অনেকটা পার্টির মধ্যে ভাঙনের গুঞ্জন। ঠিক তাই, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে যে বিভক্তির তথা উপদলীয় কোন্দলের সুর বেজে উঠেছে তা অনেকটা স্পষ্ট। সামগ্রিক প্রতিবেদনের উপর বিদায়ী কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতির বক্তব্য প্রথমেই মূলত বিভেদপন্থীদের তরফ থেকে দাবি করা হয়। যথারীতি এম এন লারমা তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বিদায়ী কেন্দ্রীয় কমিটিতে সভাপতি হিসেবে সামগ্রিক আন্দোলনের বাস্তব অবস্থা তুলে ধরেন এবং অত্যন্ত সহজবোধ্য ভাষায় আন্দোলন-সংগ্রামের রূপরেখা তথা প্রগতিশীল চিন্তাধারার ভূমিকা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন। পক্ষান্তরে তৎসময়ের বিভেদপন্থীদের মুখপাত্র রূপে আবির্ভূত হন তৎকালীন বিশেষ সেক্টরের কমান্ডার ত্রিভঙ্গীল দেওয়ান (পলাশ)। বিদায়ী কেন্দ্রীয় কমিটির সামগ্রিক প্রতিবেদনের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি আবেগের বসে বলে বসলেন তিনি দুর্নীতি পরায়ণ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার দাবি

উত্থাপন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তৎসময়ে কেন্দ্রীয় সদস্য শঙ্কর বাবু (রাম কিশোর চাকমা) হাত নেড়ে নেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এইতো থলের বিড়াল বেড়িয়ে পড়েছে, তারা দুর্নীতির পক্ষে'। যাহোক একে একে পরবর্তীতে মূলত লড়াই সংগামের নীতিগত অবস্থানকে কেন্দ্র করে এইভাবে সকাল বেলা ও বিকাল বেলার অধিবেশনে নানা বিতর্কের মধ্যে চললেও তৎসময়ে প্রতিনিধি সদস্য অনুপ (সুধাসিন্ধু খীসা)-এর গঠনমূলক বক্তব্যে সম্মেলনের পরিস্থিতি মোটামুটি স্বাভাবিক হয়ে আসে। এইভাবে পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচন।

ইতোপূর্বে ১৯৭৭ সালে প্রথম মহাসম্মেলনে বিদায়ী কেন্দ্রীয় কমিটির গঠিত প্যানেল কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত কমিটি সম্মেলনে সেভাবে সর্বসম্মতিক্রমে কণ্ঠভোটে পাশ হয়ে যায়। কিন্তু এবারে তা হলো না, বরং বিদায়ী কমিটির প্রস্তাবিত প্যানেল-এর উপর বিকল্প প্যানেল প্রস্তাব করা হয় গিরি-প্রকাশের নেতৃত্বে। গিরি অবশ্য সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন না, তিনি বাইরে থেকে যাবতীয় কলকাটি নেড়েছেন। আর প্রকাশ, দেবেন, পলাশ সম্মেলনে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা রাখেন। প্রথম মহাসম্মেলনে যা হতে পারেনি, বিভেদপন্থীরা বিকল্প একটা প্যানেল উপস্থাপন করে তাই করলো। তাই দুইটি প্যানেলকে নিয়ে ভোটের ব্যবস্থা করতে হলো সম্মেলন পরিচালনা কমিটিকে। শেষ পর্যন্ত বিভেদপন্থীরা ভোটে হেরে গেলো। তাই তাদের আর গঠনতান্ত্রিক অভ্যুত্থান চেষ্টা ব্যর্থ হলো। সেখানেই মূলত গিরি, প্রকাশ, দেবেন, পলাশ এই চার চক্রের নির্বাচনের মাধ্যমে হেরে যাওয়ার পর তাদের সামরিক অভ্যুত্থান করার আর সাহস হয়ে উঠেনি। মূলত দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্র যে শুরু হয়েছে এটা একেবারে সম্মেলন শুরু হতে শেষ পর্যন্ত বিভেদপন্থী চক্রান্তকারীদের কথা-বার্তা, আলাপ-আলোচনাতেই স্পষ্ট হয়ে উঠে। তা সত্ত্বেও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে সভাপতি, ভবতোষ দেওয়ান (গিরি)-কে সম্পাদক করে পুনরায় নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হলো। এরপর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর নব নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটিকে একের পর এক সকল সেক্টর হতে আগত প্রতিনিধিবৃন্দগণ নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটিকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতিমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে অভিনন্দন জানিয়ে পরবর্তী পর্যায়ক্রমে সভাপতিমণ্ডলীর ভাষণ শেষে এক সপ্তাহব্যাপী সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটলো।

এই যে সপ্তাহব্যাপী সম্মেলন চলাকালে অবসর সময়ে অনেকের সাথে সম্মেলনের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা হলেও একটা বিস্ফোরনমুখ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের বাস্তবতা নিয়ে তেমন বেশি কেউ মুখ খুলছেন না। তাই আমিও যাদের সাথে আমার বন্ধুত্বটা একটু ঘনিষ্ট, তাদের সাথেই যৎসামান্য কথা শেয়ার করি আর অন্যদের সাথে শুধু মাত্র সৌজন্যমূলক আলাপ ব্যতীত আর বেশি অগ্রসর হইনি। অবশেষে যখন সম্মেলনের পরিসমাপ্তি হলো তখন নিজ কর্মস্থলে ফেরার পালা। তা সত্ত্বেও নেতার সাথে সাক্ষাত করে পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করতে গেলাম। সর্বশেষ আলাপে নব নির্বাচিত সভাপতি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আমাকে বলেছেন, 'মনে রাখবে, সামন্তরা হল ভীরু, তারা সংগ্রামবিমুখ, পরনির্ভরশীল, সুবিধাবাদী এবং আপোষমুখী। তবে তারা হিংস্র, তাই তাদের কাছ থেকে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। চিন্তা করো না, ভয়ের কোন কারণ নেই, নিয়মিত যোগাযোগ রাখাটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'

তাঁর সাথে আলাপের সময় আমার মনে অনেক চিন্তা-ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছিল। অথচ এই সম্মেলন এমন সময় অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যখন পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সরকারি গোপন সিদ্ধান্তক্রমে অমুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলকে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার উদ্দেশ্যে চার লক্ষাধিক মুসলমান বাঙালি বসতি প্রদানের কাজ জোরদারভাবে চলছে। তৎসময়ে পুনর্বাসিত সেটেলারের উদ্দেশ্যে দলীয় তরফ থেকে প্রচারপত্র বা লিফলেট সর্বত্র বিলি করা হয়। তাতে আহ্বান করা হয়েছে যাতে তারা জুম্মদের উচ্ছেদ করে সেটেলার পুনর্বাসন কাজে সরকারি বাহিনীকে সহযোগিতা না করেন এবং নিজ স্থায়ী জায়গায় ফিরে যান। যেখানে সেটেলার সেখানে শান্তিবাহিনী প্রতিরোধ করবে এবং তা হবে সশস্ত্র প্রতিরোধ। কিন্তু সেটেলাররা সে কথায় কান দেয়নি। অথচ সেটেলার পুনর্বাসনের পূর্বেও সেনাবাহিনী কতিপয় এলাকায় জুম্মদের উচ্ছেদ করার জন্য পরিকল্পিতভাবে হত্যাকাণ্ড চালায় সম্পূর্ণ ঠাণ্ডামাথায়, কোন কারণ ছাড়াই। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৭৯ সালে খাগড়াছড়ির পানছড়ির কানুনগো পাড়ায় প্রকাশ্য দিবালোকে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড চালায়। শত শত ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া হয়। শতাধিক জুম্ম নরনারীকে হত্যা করা হয় ও ধর্ষণ করা হয় বহু নারী ও শিশুকে।

তেমনি ১৯৮০ সালে ২৫ মার্চ। কাউখালী আর্মি জোন হেডকোয়ার্টার হতে কলমপতি ইউনিয়নের বৌদ্ধ বিহার নির্মাণকল্পে জোন কমান্ডার জনসভা ডাকেন। সরল বিশ্বাসে এলাকার জনগণ ঐ সভাস্থলে সমবেত হন, কতিপয় বৌদ্ধ ভিক্ষুও উপস্থিত হন। কিন্তু কি ঘটলো? সেনাবাহিনী উপস্থিত জনতাকে দুই লাইনে দাঁড় করিয়ে সম্পূর্ণ ঠাণ্ডামাথায় প্রকাশ্য দিবালোকে ব্রাশ ফায়ার করে ৩০০ জুম্মকে তাৎক্ষণিকভাবে হত্যা করে এবং জুম্মদের বিভিন্ন গ্রামের (১০/১২টি গ্রামের) ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে দেয় এবং কয়েকশত জুম্মকে মারপিট করে এবং অনেক নারী-শিশুকে ধর্ষণ করে। যে হত্যাকান্ড ভারতবর্ষের ইতিহাস খ্যাত ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল বৃটিশ জেনারেল ডায়েরের নির্দেশে নিরস্ত্র জনতাকে

জালিয়ানওয়ালাবাক হত্যাকাণ্ডের চেয়েও ভয়ংকর ছিল। অসহায় জুম্ম জনতা নিজ ভূমি ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। আর এই জুম্ম শূন্য এলাকায় সেনাবাহিনীর ক্ষমতাকে অপব্যবহার করে মুসলমান সেটেলারদের পুনর্বাসন প্রদান করা হয়। যা তৎসময়ে জাতীয় সংসদের সংসদীয় কমিটি কর্তৃক তদন্ত করে প্রমাণিত হয়। ঐ কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালীন সাংসদ শাহজাহান সিরাজ, রাশেদ খান মেনন ও উপেন্দ্র লাল চাকমাসহ আরো অনেকে। ঐ ঘটনায় একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুও নিহত হন এবং কায়কজন ভিক্ষু আহত হন।

শুধু তাই নয়। তৎসময়ে সেটেলারদের পুনর্বাসন প্রতিরোধ সংগ্রাম পরিচালনাকালে ১৯৮১ সালের ২৩ জুন মাটিরাঙ্গার গোমতি গণহত্যা তৎকালীন সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালনা করা হয় আর সেটেলারদের দিয়ে বিভিন্ন জুম্ম গ্রাম লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে ১০/১২টি গ্রাম সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করা হয়। ফলে অসহায় জুম্মরা পালিয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। উক্ত ঘটনায় শতাধিক জুম্ম নিহত হন এবং বহু নারী শিশু ধর্ষিত হন। উক্ত ঘটনার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠে এবং বাংলাদেশ সরকারের উপর আন্তর্জাতিকভাবে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। তাতে সরকারের কাছে এন্টি-স্লেভারি সোসাইটি, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনার প্রতিবাদ জানান এবং অবিলম্বে এরূপ হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। এমনি একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে গেলে অবশ্যই সেটেলারদের পুনর্বাসন প্রতিরোধ কার্যক্রম জোরদার করার প্রয়োজন ছিল। তেমনি এক বাস্তব অবস্থার মধ্যে দলীয় দ্বিতীয় মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যেখানে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ সংগ্রাম জোরদার করা অপরিহার্যতা দেখা দিয়েছিল, সেই অবস্থায় গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ এই চারচক্রের এহেন অগণতান্ত্রিকভাবে দলীয় ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র করা যে কতটুকু অপরিণামদর্শী এবং আত্মঘাতি কাজ, ভাবতে অবাক লাগে। এতটুকু মানসিক অধঃপতন তাদের ঘটলো কি করে? তাই প্রশ্ন জাগে, দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র না হলে এরূপ কখনোই হতে পারে না।

এসব ভাবতে ভাবতে চলে এলাম নিজ বিছানায়। আমাদের সেক্টরের প্রতিনিধিবৃন্দও একে একে সবাই যার যার আলাপ রয়েছে, তারা কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ ছেড়ে আসলো। এবার কর্মস্থলে ফেরার পালা। দুপুরে খাওয়ার পর একে একে সবার সাথে বিদায় নিয়ে রওয়ানা হলাম। একই পথে পথ চলা শুরু, যার যার রুখসেক নিয়ে। প্রায় দুই ঘন্টা হাঁটার পর একটি গ্রামের গণলাইনের পোস্টে পৌঁছলাম। সেখানে সামান্য রেস্ট নেওয়ার পর গণলাইনের লোক বদল হলো। নতুন লাইনের লোক নিয়ে আবার হাঁটা শুরু, বেলা সাড়ে ৪ টায় আবার একটা গ্রামে পৌঁছে গেলাম। সেখানে বিকেলের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সেখানে গ্রামের পঞ্চায়েতের সভাপতির বাড়িতে গণলাইনের লোকমাধ্যম খাবারের ব্যবস্থা হলো, সেখানে অপ্রত্যাশিতভাবে বিশেষ সেক্টর কমান্ডার পলাশ (ত্রিভঙ্গীল দেওয়ান) এর সাথে দেখা হলো। সম্মেলন শেষ হবার পরপরই তিনি বাইরে এসে যান বলতে গেলে বাড়িতে ছুটি কাটাতে। সম্ভবত যে বাড়িতে উঠেছি সেটাই তাঁর নিজস্ব (অস্থায়ী বাড়ি)। সেখানে বসেই আমরা রাতের খাবার না খাওয়া পর্যন্ত আলোচনায় মেতে উঠলাম। আমি তাঁকে দ্রুত নিষ্পত্তির তত্ত্বের ব্যাখ্যা চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারলেন না। তাই আমি বললাম, 'তাহলে মানুষ দিবা অন্ধের মত কেন আপনাকে সমর্থন করবে। যেখানে আপনি কিভাবে আন্দোলনের দ্রুত সফল সমাপ্তি ঘটবে তার কোন রূপরেখা দিতে পারেন না, সেখানে কতিপয় অন্ধ সমর্থক হাঁটলেও কোন রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তি অবশ্যই হাঁটতে পারেন না। যে কোন আন্দোলন কারোর ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনুযায়ী আরম্ভ যেমন হতে পারে না, তেমনি সফলতাও নির্ভর করে বাস্তবতার উপরে। বাস্তবে হয়েছেও তাই।

সেদিনকার আলাপ হতে হতে খাবার সময় হলো। আমরা সামরিক এস্কর্টসহ ১৫ জন ছিলাম। তিনজন করে পাঁচটি বাড়িতে খাবারের ব্যবস্থা হলো। সেখান থেকে ভাত খাওয়ার পর পান-সুপারি আর দাবা খাবার পর আবারও হাঁটা আরম্ভ। হাঁটতে হাঁটতে রাত ৯টার পর খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার উত্তরের একটি গ্রামে আমরা পৌঁছলাম। গ্রামটির নাম আমার মনে নেই। সেখানে পাশাপাশি দুইটি বাড়িতে ঘুমিয়ে পড়ি। অবশ্য সেন্ট্রি ডিউটি ও পাসওয়ার্ড রওয়ানা হওয়ার সাথে সাথেই (পলাশের সেখান হতে) ঠিক করা হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠার পর দেখি গৃহস্থের গৃহিনী সকালের টিফিন তৈরিতে ব্যস্ত। এদিকে হাতমুখ ধোয়ার পর গৃহস্থ দাবা নিয়ে আসলেন। দাবা টানতে টানতে গৃহস্থ হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসলেন, 'বাবু, আপনাদের আলাপ কেমন হলো। এদিকে কি লাম্বা বাদি নানা প্রকার গুঞ্জন শুনতেছি'। আমি সে বিষয়ে গৃহস্থকে বললাম, 'বাবু সেব্যাপারে আপনাদের পার্টির উপর আস্থা-বিশ্বাস রাখা উচিত, পার্টি কোনদিন জনগণের অমঙ্গল চায়নি, এখনও চায় না এবং ভবিষ্যতেও চাইবে না। পার্টির নেতা-নেতৃত্ব সব কিছু যথাসময়ে মোকাবিলা করবে। সে ব্যাপারে আপনাদের মাথা ঘামানো ঠিক হবে না'।

তারপর সকালের খাবার খাওয়ার শেষে পুনরায় হাঁটার পালা। আবার রওনা হলাম। হাঁটতে হাঁটতে ২/৩ ঘন্টা হাঁটার পর খাগড়াছড়ি শহরের উত্তর-পূর্ব পার্শ্বের একটা গ্রামে পৌঁছে গেলাম। সেখানে বিকালের অর্থাৎ রাতের খাবারের ব্যবস্থা হলো। পাশাপাশি গণলাইন-এর লোকমাধ্যম খাগড়াছড়ি

দীঘিনালার বড় রাস্তা পারি দেবার জন্য যাবতীয় লোক নিয়োগ করা হলো। রাতের খাবার খাওয়ার পর সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আবার হাঁটা শুরু। এইভাবে যথাযথ নিয়মে বাউন্ডস পারি দিয়ে কমলছড়ির আগা পাড়ার জুম চাপে এসে রাত্রি যাপন করলাম। সেখানে পাশাপাশি তিনটি জুমের ঘর ছিল। সেখানে সকালের খাবারের ব্যবস্থা হলো। খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে সেখান থেকে সেক্টর হেডকোয়ার্টারে আসার আগে 'আরএম জোনের ও কেসি জোনে'র প্রতিনিধিবৃন্দ যার যার কর্মস্থলে চলে গেলেন আর বাকীরা সেক্টর হেডকোয়ার্টারের দিকে অগ্রসর হলাম। উল্টাছড়ি এলাকায় আসার পর 'এল জোনে'র প্রতিনিধিবৃন্দ তাদের পথে চলে গেলেন। আর আমি সেক্টর কার্যালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে কার্যালয়ের আউটপোস্টে এসে সেখানে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি নিজ কর্মস্থলে 'এন জোন' এলাকায় গণলাইন-এর লোক ধরে চলে আসি।

এখানে একটা বিষয় বার বার আমার কাছে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, এম এন লারমা সম্মেলনের যে বিস্ফোরণোন্মুখ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মত একটা পরিস্থিতিকে বিচক্ষণতার সাথে অত্যন্ত ধীরস্থির চিত্তে স্বাভাবিকভাবে মোকাবেলা করেছিলেন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই। তিনি চেয়েছিলেন সকল দেশপ্রেমিক কর্মী বাহিনীকে সঙ্গে নিয়েই দলীয় নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দেলনকে এগিয়ে নিতে। কিন্তু গিরি, প্রকাশ, দেবেন, পলাশ এই চার চক্র নিজেদের দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, ক্ষমতার উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্যই নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সম্মেলন সমাপ্তির পর পর সাধারণ কর্মী ও জনগণের মধ্যে অপপ্রচার ছড়ানো শুরু করলেন। এইভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামব্যাপী নানা প্রকার গুজব ছড়ানা অব্যাহত রাখলো। পাশাপাশি বিশেষ সেক্টর হেডকোয়ার্টার এলাকার আওতাধীন কর্মীদের নিয়ে এবং এস.পি.এল কোম্পানীর কতিপয় কমান্ডারকে দলীয় নেতা-নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে নতুন ষড়যন্ত্রের জাল তৈরি করেন। একই সময়ে কেন্দ্রীয় অস্ত্রাগার বিভেদপন্থীদের একটি সশস্ত্র বিদ্রোহী দল দখল করে নিয়েছে বলে খবর পাওয়ার পর কেন্দ্রীয় বাহিনীর উদ্যোগে উক্ত অস্ত্রাগার পুনঃদখল সহ বিদ্রোহ দমনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় ১৪ জুন ১৯৮৩ তারিখে। সেদিন তাদের অর্থাৎ বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় বাহিনী কর্তৃক ঘেরাও করার পর তাদের জানানো হয় প্রাণে বাঁচার ইচ্ছে থাকলে সারেন্ডার করতে। কিন্তু বিদ্রোহীরা আত্ম-সমর্পণ না করায় বাধ্য হয়ে তাদের আঘাত হানতে হয়। ঘটনাস্থলে বলি ওস্তাদ নিহত হন। অতপর অস্ত্রাগার বিদ্রোহী গ্রুপ থেকে উদ্ধার করা হয়। এরপর হতে শুরু হয়ে যায় বিদ্রোহী বিভেদপন্থীদের সাথে আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ। এরই মধ্যে দক্ষিণের ই-কোম্পানীর একটি ফাইটিং গ্রুপ ও ২নং সেক্টর হতে যাওয়া ১টি ফাইটিং গ্রুপ ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাথে যুক্ত হয়ে 'ডিডিএফ' গঠন করে সম্পূর্ণ বিদ্রোহ দমনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

তা সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণ আলোচনার ভিত্তিতে সমাধানের পথ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সবসময় খোলা রেখেছিল। কিন্তু বিভেদপন্থীরা ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নেয়। তারা পুনরায় 'ক্ষমা করা ভুলে যাওয়া' নীতির ভিত্তিতে আবারও ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। তাতে আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ তথা সংঘর্ষের পথ পরিহার করা হয়। কিন্তু বিভেদপন্থীরা আরো ষড়যন্ত্রের গভীরে চলে যায়। ১নং সেক্টর হতে একটি ফাইটিং গ্রুপ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের দিকে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের অগোচরে আনার ব্যবস্থা করে। তৎকালীন ১নং সেক্টর কমান্ডার দেবেন (দেবজ্যোতি চাকমা) সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করে নভেম্বরের প্রথম ভাগে + কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিদ্রোহী অংশের সাথে যুক্ত হয়ে ১নং সেক্টর হতে আসা সশস্ত্র ফাইটিং গ্রুপের সাথে একত্রিত হয়ে– ১০ই নভেম্বর ১৯৮৩ তারিখে বৃষ্টি ভেজা কালো রাতে কেন্দ্রীয় কার্যালয় আক্রমণ করে, সেন্ট্রি ডিসপোজেল করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা, নিপীড়িত, নির্যাতিত গণমানুষের অকৃত্রিম বন্ধু, জুম্ম জাতীয় চেতনার অগ্রদূত মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাসহ অপর আটজন সহযোদ্ধাকে ব্রাশ ফায়ারের মাধ্যমে বিদ্রোহী কমান্ডার এলিনের বাহিনী কর্তৃক হত্যা করে চলে যায়।

জানা যায় প্রথম গুলির আঘাতে আহত নেতা বলেছিলেন, 'আমাকে মেরে যদি তোমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠাতা হয়, তবে একেবারে আমাকে মেরে ফেলো'। একথা বলার সাথে সাথে এলিন নিজেই আবারও ব্রাশ ফায়ার করে নেতার জীবন প্রদীপ চিরকালের জন্য স্তব্ধ করে দেয়। তারপর দ্রুত স্থান পরিত্যাগ করে। শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। জুম্ম জাতীয় কুলাঙ্গার বিশ্বাসঘাতক গিরি, প্রকাশ, দেবেন, পলাশ চক্র নামক বিভেদপন্থীদের গুলির আঘাতে মহান নেতার পার্থিব জীবন কেড়ে নিলেও তার নীতি-আদর্শে গড়ে উঠা দলীয় নেতৃত্ব ও তার চিন্তা চেতনাকে ধ্বংস করতে পারেনি। শহীদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা যে জীবন্ত লারমার চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী হতে পারে তা বিভেদপন্থীদের ২৯ এপ্রিল ১৯৮৫ তারিখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিকট সশস্ত্র আত্মসমর্পণের মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয়। অতপর গৃহযুদ্ধের চূড়ান্ত অবসান ঘটে। অবশ্য এই গৃহযুদ্ধের সময়কালে জনগণ চূড়ান্তভাবে হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েন। নানা রকম প্রশ্ন জনগণের মধ্যে দেখা দেয়। গৃহযুদ্ধের চূড়ান্ত অবসান হলো বিভেদপন্থীদের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে।

১০ নভেম্বর ২০২০। প্রয়াত নেতার ৩৭তম মৃত্যুবার্ষিকী। এই

দিনে প্রয়াত নেতাসহ যারা শহীদ হয়েছেন তাদের অমূল্য আত্মত্যাগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। এই দিনে আমার মানসপটে ভেসে উঠে ১৯৮২ দ্বিতীয় জাতীয় মহাসম্মেলনের কথা। মহান নেতার সাথে শেষ সাক্ষাৎকারের কথাটি আজও ভুলিনি। তার সেই উক্তিটি কতটুকু বাস্তব সম্মত– তা বর্তমান প্রেক্ষাপটেও একেবারেই প্রত্যক্ষ করার মত। তিনি যে প্রকৃতই একজন মহান চিন্তাবিদ, দুরদর্শী বিপ্লবী নেতা ছিলেন সে ব্যাপারে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে তৎকালীন গণপরিষদের বিভিন্ন অধিবেশনে তার ভাষণ সম্বলিত স্মারকগ্রন্থটি পাঠ করলেই বুঝা যায়। তিনি শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের নয়, তিনি একজন আন্তর্জাতিকতাবাদী বিশ্বমাপের নেতা ছিলেন। কিন্তু বিভেদপন্থীরা দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝেনি। তাই তারা আত্মঘাতী বিলোপের পথ বেছে নিয়েছে। মহান নেতার এই মহান প্রয়াণে জুম্ম জাতি হারিয়েছে জাতীয় চেতনার অগ্রদূত, মহান দেশপ্রেমিক, মুক্তির দিশারীকে। বিশ্বের নির্যাতিত, নিপীড়িত শোষিত বঞ্চিত জনগণ হারিয়েছে এক অকৃত্রিম বন্ধুকে, আর দেশ হারিয়েছে এক মহান বিপ্লবী নেতাকে। মহামতি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আজ আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তার নীতি আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে উঠা পার্টি, তারই প্রদর্শিত পথ হতে শত প্রতিকুলতা সত্ত্বেও আজও বিচ্যুত হয়নি। জুম্ম জাতি যতদিন স্বীয় অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকবে ততদিন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা চিরজীবী হয়ে থাকবেন।

তাঁর প্রদর্শিত পথে জুম্ম জনগণ এগিয়ে যাবেই এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা না হওয়া অবধি লড়াই-সংগ্রাম করে যাবে। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা দীর্ঘজীবী হোক।

> আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণও বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের ভাই-বোনদের সাথে একযোগে এগিয়ে যেতে চাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ মনে করে এবং বিশ্বাস করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের যুগযুগান্তের অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা তুলে দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের সংরক্ষণের অধিকার দেবে। – *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*

‘আমি বাঙালি নই’

ত্রিজিনাদ চাকমা

বাংলাদেশ স্মরণাতীতকাল থেকে বহু জাতি, বহু বর্ণ, বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতির একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। এদেশে বাঙালি ভিন্ন অন্যান্য জাতি যেমন গারো, হাজং, পাত্র, লুসাই, সাঁওতাল, বম, খুমী, চাক, রাখাইন, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ইত্যাদি নানা জাতি যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আসছে। এসব ভিন্ন ভিন্ন জাতির রয়েছে সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য যা বাংলাদেশের জন্য একটি সম্পদ।

কিন্তু এদেশের আইন প্রণেতা ও শাসকগোষ্ঠী এ বৈচিত্র্যপূর্ণ অমূল্য সম্পদকে কতটুকু অনুধাবন করতে পারেন তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। এদেশে বসবাস করা অপরাপর জাতিসমূহ ঐতিহাসিকভাবে নানা নিগ্রহের শিকার হয়ে আসছে। তাদেরকে প্রান্তিকতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাদের অস্তিত্ব ধ্বংস করা হচ্ছে। আমরা বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের প্রারম্ভিক অবস্থা থেকে তা দেখতে পাই।

এ অঞ্চলে ব্রিটিশদের উপনিবেশিক শাসন-শোষণের ইতিহাস বাদই দিলাম। কিন্তু স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্র ছিল আগাগোড়াই মৌলবাদী। তাই পাকিস্তানী শাসন-শোষণে আদিবাসী জনগণের অস্তিত্ব বিপন্ন ছিল। পাকিস্তানী শাসন ও শোষণের যাঁতাকল থেকে মুক্তির প্রয়াসে বাঙালিদের সঙ্গে এদেশের আদিবাসীরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাও আশা করেছিলেন, জাতিগত নিপীড়ন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী শাসকশ্রেণি জুম্ম জাতির শত বছরের শোষণ ও বঞ্চনার বেদনা বুঝবে। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হতে না হতেই বাঙালি ভিন্ন অন্যান্য জাতিসমূহের অভিজ্ঞতা তিক্ত হতে আরম্ভ করল। যে প্রেরণা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তারা মুক্তিযুদ্ধ করেছিল তা নিমিষেই শেষ হল। কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঘোষণা– ‘উর্দু, কেবল উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা’, ঠিক সেই কায়দায় বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক ঘোষিত হতে থাকে যে, ‘বাংলাদেশে একটি মাত্র জাতি তা হলো বাঙালি জাতি’।

৩১ অক্টোবর ১৯৭২ বাংলাদেশের আদিবাসীদের জন্য একটি কালো দিন। স্বতন্ত্র জাতিসত্তার অধিকারী বৈচিত্র্যপূর্ণ জাতিসমূহকে সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে বাঙালিতে পরিণত করার একটি ঘৃণ্য দিন। ঐদিন সংবিধান বিল বিবেচনা (দফাওয়ারী পাঠ) এর উপর বাংলাদেশ গণপরিষদের অধিবেশন চলছিল। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকারী আওয়ামী লীগের সদস্য আহম্মদ রাজ্জাক ভূঁইয়া বাংলাদেশ সংবিধান বিলের ৬নং অনুচ্ছেদের উপর একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সেটি হলো- ‘৬। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে, বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালী বলিয়া পরিচিত হইবেন।’

পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সাথে সাথে দৃঢ়তা সহকারে এটার প্রতিবাদ করলেন। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, স্মরণাতীত কাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী জাতিসমূহকে বাঙালি বলে নাই। আমরা বাঙালি নই। তিনি সেদিন বলেছিলেন–

> ‘আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি, সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে বসবাস করে আসছে। বাংলাদেশের বাংলা ভাষায় বাঙালিদের সঙ্গে লেখাপড়া শিখে আসছি। বাংলাদেশের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সব দিক দিয়েই আমরা একসঙ্গে বসবাস করে আসছি। কিন্তু আমি একজন চাকমা। আমার বাপ, দাদা, চৌদ্দ পুরুষ– কেউ বলে নাই, আমি বাঙালী।

আমার সদস্য-সদস্যা ভাই-বোনদের কাছে আমার আবেদন, আমি জানি না, আজ আমাদের এই সংবিধানে আমাদেরকে কেন বাঙালি বলে পরিচিত করতে চায়...। মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমাদিগকে বাঙালি জাতি বলে কখনো বলা হয় নাই। আমরা কোনদিনই নিজেদেরকে বাঙালি বলে মনে করি না। আজ যদি এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধানের জন্য এই সংশোধনী পাশ হয়ে যায়, তাহলে আমাদের এই চাকমা জাতির অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে। আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। আমরা আমাদেরকে বাংলাদেশী বলে মনে করি এবং বিশ্বাস করি। কিন্তু বাঙালি বলে নই।’

শত শত বছর ধরে জুম্ম জনগণের উপর চলা নির্মম বিজাতীয় শাসন-শোষণের ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে এমএন লারমার বলিষ্ঠ জবাব ‘আমি বাঙালি নই’। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশের নব্য শাসকগোষ্ঠী যখন উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উন্মত্ত ও আত্মহারা এবং জুম্ম জনগণ তথা বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিসমূহের অস্তিত্ব চিরতরে লুপ্ত করে দিয়ে বাঙালি জাতিতে পরিণত করার গভীর ষড়যন্ত্র চলছিল তখন ‘আমি বাঙালি নই’ গণপরিষদের ভেতরে ও বাইরে এমএন লারমার বজ্রকঠিন এই জবাব নিঃসন্দেহে একটা অতুলনীয় ও অবিস্মরণীয় সাহসী প্রতিবাদ।

আজ রাষ্ট্রের সকল শাখায় দুর্নীতি, দলীয়করণ ও দুর্বৃত্তায়ন। নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনায় বাংলাদেশ আলোচিত। দুঃশাসনে পুরো দেশ ডুবে গেছে। গণতন্ত্র মুখ থুবড়ে পড়েছে। স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা এখন একাকার। অথচ সেই সময়ে গণপরিষদে দেওয়া মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার বক্তব্য, সুপারিশ ও চিন্তা মোতাবেক এ দেশ পরিচালিত হলে আজ অন্য রকম এক উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ পেতে পারতাম। এম এন লারমা উদার, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ ও বহুজাতির বৈচিত্র্যপূর্ণ বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জাত্যাভিমানী ও উগ্র বাঙালি জাতীয়তবাদ তাঁর সেই স্বপ্নকে চুরমার করে দেয়। পরবর্তীতে জুম্ম জাতীয় অস্তিত্বও যখন এ উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রভাবে হুমকির সম্মুখীন হলো তখন তিনি বিকল্প পথ ধরতে বাধ্য হলেন। নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি জুম্মদের একমাত্র রাজনৈতিক দল পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠন করেন। এ দলের সংগ্রামের ইতিহাস আমরা সবাই জানি। তাঁর হাতে গড়া এ দল ১৯৯৭ সালে জুম্মদের অধিকারের সনদ 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' স্বাক্ষর করতে সরকারকে বাধ্য করে। যদিও চুক্তির ২৩ বছর পরেও মৌলিক বিষয়গুলো এখনও অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়ে গেছে।

> শত শত বছর ধরে জুম্ম জনগণের উপর চলা নির্মম বিজাতীয় শাসন-শোষণের ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে এমএন লারমার বলিষ্ঠ জবাব 'আমি বাঙালি নই'।

৩০ জুন ২০১১ সাল বাংলাদেশের আদিবাসীদের জন্য দ্বিতীয় কালো দিবস। এ দিন দেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী গৃহীত হয়। সেদিন সংবিধান সংশোধনের মহান উদ্যোগের মাধ্যমে চল্লিশ বছর পর যথাযথভাবে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দারুন সুযোগ সৃষ্টি হলেও সকল জনদাবিকে অগ্রাহ্য করে জাতীয় সংসদে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বিল পাশ করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জনগণকে জাতি হিসেবে বাঙালি পরিচিতি প্রদান করা হয়েছে যার মাধ্যমে সংবিধানে আদিবাসী জাতিসমূহকে আবারো নতুন করে সাংবিধানিকভাবে 'বাঙালি' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

অপরদিকে আদিবাসীদেরকে 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকৃতি লাভের প্রাণের দাবিকে উপেক্ষা করে সংখ্যাগরিষ্ঠের জোরে সংবিধানে তাদেরকে 'উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং পূর্বের মতো সংবিধানে আদিবাসী জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভূমি সংক্রান্ত মৌলিক অধিকারগুলো অস্বীকার করা হয়েছে। সর্বোপরি ধর্মীয় বৈষম্যমূলক বিধানাবলীর বিলোপ করত '৭২-এর সংবিধানের চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি পুনর্বহালের সুপ্রীম কোর্টের রায়কে অস্বীকার করে সামরিক শাসক কর্তৃক প্রবর্তিত 'রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম' এবং 'বিসমিল্লাহির-রহমানির-রহিম' সম্বলিত ধর্মাশ্রয়ী বিধানাবলী আরো পাকাপোক্ত করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, আদিবাসীদের আন্দোলন-সংগ্রামের কোন বিকল্প নেই। সংগ্রামের মধ্য দিয়েই নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখতে হবে। অন্যথায় আমাদের চিহ্ন হারিয়ে যাবে। মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংগঠন করার অধিকার সবার রয়েছে। বাংলাদেশে আদিবাসীদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই-সংগ্রাম চলমান রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামেও চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন চলছে। এ আন্দোলন যখনি জোরদার হয়েছে তখনি শাসক-শোষক মহল থেকে ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়েছে। আমাদের উপর 'ভাগ করো, শাসন করো এবং ধ্বংস করো' নীতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। এভাবে আমাদেরকে দুর্বল করে ও দমন-পীড়ন বাড়িয়ে দিয়ে চুক্তি বাস্তবায়ন না করার সরকারি তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলনকর্মীদের চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যায়িত করে সরকার ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করছে। এভাবে সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে একপাশে সরিয়ে রেখে তার স্বার্থ হাসিল করে চলেছে। জুম্মদের ভূমি জোরপূর্বক বেদখল করা হচ্ছে। মা-বোনদের ইজ্জত কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে। আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব চরম হুমকিতে নিপতিত হয়েছে। এক্ষেত্রে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জীবন ও সংগ্রাম আমাদের একমাত্র পাথেয় হতে পারে। শিরদাঁড়া উঁচু করে বেঁচে থাকা। অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করা। ন্যায্য অধিকারের জন্য আমৃত্যু লড়ে যাওয়া।

নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষেরই নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

বাচ্চু চাকমা

বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে উপমহাদেশে ব্রিটিশ আমলের শেষ পর্যায়ে ১৯৩৯ সালে ১৫ সেপ্টেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে জন্মলাভ করেন মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। তাঁর বাড়িতে সবাই তাকে আদর করে ডাকতেন মঞ্জু। মহাপুরম (মাওরুম) গ্রাম, বুড়িঘাট মৌজা, নানিয়াচর থানা, রাঙ্গামাটি জেলায় তাঁর জন্মস্থান। বর্তমানে কাপ্তাই লেকের অথৈ জলে বিলিন হয়ে গেছে সেই মহাপুরমের ঐতিহাসিক সমৃদ্ধ গ্রাম। তিনি আমৃত্যু ছিলেন বিপ্লবী ও প্রতিবাদী একজন নেতা। পশ্চাদপদ ও ঘুঁণেধরা সামন্ততান্ত্রিক জুম্ম সমাজের এমন একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, যে পরিবার সর্বপ্রথমে রক্ষণশীল, পরনির্ভরশীল ও প্রগতিবিরোধী সামন্তবাদের বিরোধিতা করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে সামিল হন এবং জুম্ম সমাজের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রচলন ও প্রসারের আন্দোলন শুরু করেন। পারিবারিক ক্ষেত্রেও এম এন লারমা ছোটবেলা থেকেই সংগ্রামী চেতনায় ও বিপ্লবী মহান আদর্শে গভীরভাবে প্রভাবিত হন।

ছাত্রজীবন থেকে তিনি বিপ্লবী রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। স্কুলজীবন থেকে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের উপর শাসকগোষ্ঠীর দমন-পীড়ন, নির্মম-শোষণ, নিপীড়ন ও বঞ্চনার বাস্তবতাগুলো অন্তরের গভীরে গিয়ে অনুভব করতেন। জুম্ম জাতীয় জীবনে যে দুর্যোগ, দুরাবস্থা তা দেখে একদিকে তিনি বেদনা ও যন্ত্রণায় আহত হতেন, অন্যদিকে সেই বেদনা থেকেই গভীর সংগ্রামী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে জুম্ম জাতির মুক্তির পথ খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করতেন। জুম্ম জাতির এই নির্মম বাস্তবতাগুলো প্রিয়নেতা এম এন লারমাকে নিপীড়িত মানুষের নেতা হয়ে উঠবার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিশ্বব্যাপী ডামাডোলের পরিস্থিতিতে চরমভাবে মানবিক বিপর্যয়, ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তি ও জুম্ম জাতির সাথে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর চরম অন্যায়-অবিচার, ১৯৬০ সালে জুম্ম জনগণের মরণফাঁদ কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ ও নিজ বাস্তুভিটা থেকে লক্ষাধিক আদিবাসী জুম্ম উচ্ছেদ ইত্যাদি তখনকার সময়ের শাসকগোষ্ঠীর অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন তথা জুম্ম জাতির বিপর্যয়ের চরম সংকটেও জুম্ম জনগণ ছিল গভীর ঘুমে নিমজ্জিত। জুম্ম জাতির এহেন বিপর্যয় ও দুর্যোগের মুহূর্তে জুম্ম জনগণকে ঘুম জাগানিয়ার গান শোনাতে কেউ এগিয়ে আসেনি। তখনকার সময়ের জুম্ম জাতীয় নেতৃত্ব বা সামন্তবাদী নেতৃত্বও ছিল নির্বিকার। পার্বত্য চট্টগ্রামের এই ঐতিহাসিক নির্মম বাস্তবতার গভীর অনুভূতি থেকেই জুম্ম জনগণের ঘুম জাগানিয়ার মন্ত্র নিয়ে ৬০ দশকে এগিয়ে আসেন প্রয়াত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা।

তিনি নিজের পরিবারের পরিবেশ ও সমাজের পারিপার্শ্বিকতা থেকেই রাজনীতির শিক্ষা আরম্ভ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি অধিকারহারা জুম্ম জনগণের বেদনা ও যন্ত্রণা গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। সেই সময়ে অভিজাত শ্রেণির শোষণ, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ছিলেন তাঁর পিতা চিত্ত কিশোর চাকমা ও তাঁর জ্যাঠা কৃষ্ণ কিশোর চাকমা। তাঁর পিতাও একজন প্রগতিশীল হিসেবে সামন্ত সমাজের শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। অপরদিকে সামন্তবাদ বিরোধী ও সমাজের প্রগতিকামী কৃষ্ণ কিশোর চাকমা জুম্ম সমাজের শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলনে একজন পথিকৃৎ হিসেবে এখনও স্মরণীয় ও বরণীয়। ফলে নিপীড়িত জুম্ম জনগণের নেতা হয়ে উঠার সিঁড়ি উত্তরাধিকার সূত্রে যেমনি পেয়েছিলেন, তেমনি তাঁর যোগ্যতা ও দক্ষতার বলে তা সিদ্ধ করে নিয়েছিলেন। তাইতো প্রয়াত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে নিয়ে আজ পাহাড় কিংবা সমতলে এবং যে কোনো নিপীড়িত আদিবাসীর কাছে তাঁর গল্পের কোন শেষ নেই। কারণ তিনি শুধুমাত্র জুম্ম জনগণের নেতা নন, বাংলাদেশের গরীব দুঃখী মানুষের জাতীয় নেতাও। বাংলাদেশের গরীব-দুঃখী মেহনতি মানুষের সত্যিকার নেতা মানেই সমগ্র দুনিয়ার কৃষক, শ্রমিক তথা গরীব মেহনতি মানুষেরও তিনি একজন নেতা। এতে প্রমাণিত হয়, তিনি শুধুমাত্র জুম্ম জাতীয়তাবাদী নন, তিনি আন্তর্জাতিকতাবাদী একজন নেতাও।

কলেজ জীবনে পদার্পণ করার পর তিনি রাজনীতির বৃহত্তর পরিমণ্ডলে প্রবেশ করেন। এই সময় আরও অধিকতরভাবে জাতিগত শোষণ ও নিপীড়ন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৬০ সাল জুম্ম জাতির ভাগ্যাকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা। সেই সময়ের শাসকগোষ্ঠীর কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা জানার পর তাঁর মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। তাঁর চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে পানি ঝরে। তিনি ভাবলেন, জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব বিলুপ্তকরণে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সুগভীর ষড়যন্ত্রের কথা। কাপ্তাই বাঁধের দরজা বন্ধ করার সাথে সাথে বাঁধের পানিতে গ্রামের পর গ্রাম গ্রাস করে নিচ্ছে। ধীরে ধীরে যখন প্রয়াত নেতাদের বাড়ির দিকে ধেয়ে আসছে পানি, তখন তিনি তাদের বাড়ির

দেয়াল থেকে এক খণ্ড আর উঠোন থেকে আরেক খণ্ড মাটি নিয়ে কাগজে ভালোভাবে মুড়িয়ে তাঁর বড় বোন জ্যোতিপ্রভা লারমার হাতে তুলে দিলেন। এই মাটির খন্ডগুলো প্রাণের চেয়েও সযতনে রাখতে বলেছিলেন। এখান থেকেই প্রমাণিত হয় যে, তিনি সেই সময়ের নিজের জন্মভূমি, মাতৃভূমি ও বাস্তুভিটাকে কত গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন এবং ভালবেসেছিলেন। সেই সময়ে তিনি জুম্ম জাতির ভবিষ্যৎ নিয়েও কত চিন্তা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখতেন।

নেতৃত্বের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে, আমি 'মানি না'-একথাটি বলতে পারা। প্রয়াত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা প্রতি মুহূর্তে শাসকগোষ্ঠীর অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়নের বিরুদ্ধে 'মানি না' কথাটি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উচ্চারণ করেছিলেন। ১৯৬০ সালে ছাত্র থাকা অবস্থায় পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক অন্যায়ভাবে রাঙ্গামাটিতে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে 'মানি না' কথাটি দ্বিধাহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করে বলেছিলেন বিধায় দীর্ঘ দুই বছর যাবত তাকে পাকিস্তানের কারাগারে কারাবরণ করতে হয়েছে। তারই সূত্র ধরে সদ্য স্বাধীন দেশে ১৯৭২ এর সংবিধান রচনাকালে বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিক, দিনমজুর তথা গরীব-দুঃখী মেহনতি মানুষের মনের কথা এই সংবিধানে লেখা হয়নি বলে 'মানি না' কথাটি দ্বিধাহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন এবং মা-বোনদের কথা এই সংবিধানে লেখা হয়নি বলেও তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেছিলেন। সংবিধানে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশের সকল নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবে', তিনি এইখানেও যৌক্তিক দাবি তুলে ধরে বলেছিলেন, একজন বাঙালি যেমন চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা হতে পারে না, তেমনি একজন চাকমাও বাঙালি এবং অন্যান্য জাতি পরিচয়ে পরিচিত হতে পারে না। জাতির প্রশ্নেও তিনি খুবই সর্তক এবং সচেতন ছিলেন। উগ্র মুসলিম ধর্মান্ধ ও উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদের দাম্ভিকতার স্রোতে ভেসে গিয়ে মহান সংবিধানে এই স্পর্শকাতর বিষয়গুলো পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করেছিল তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী। তাইতো এই মহান সংবিধানে গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়নি বলে 'মানি না' কথাটি বলে প্রতিবাদ করেছিলেন এবং সংসদ থেকে প্রতিবাদ স্বরূপ ওয়াকআউট করে বের হয়ে এসেছিলেন। তারপর ফিরে এসেছিলেন তাঁর প্রিয় মাতৃভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামের আপনজনদের কাছে এবং ফিরে এসে তাঁর আপনজনদের সামনে দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে বলেছিলেন 'এভাবে আর হবে না, অন্য রাস্তা ধরতে হবে'। 'মানি না' কথাটি বলার পর তিনি শুধুমাত্র কথার মধ্যে থেমে রইলেন না, কাজেই তা প্রমাণ করে দেখালেন।

> পার্বত্য চট্টগ্রামের এই ঐতিহাসিক নির্মম বাস্তবতার গভীর অনুভূতি থেকেই জুম্ম জনগণের ঘুম জাগানিয়ার মন্ত্র নিয়ে ৬০ দশকে এগিয়ে আসেন প্রয়াত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা।

তিনি একদিকে জাতিগত শোষণ ও নিপীড়ন প্রত্যক্ষ করলেন, অন্যদিকে সেখান থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে লাগলেন। উগ্র ধর্মান্ধ পাকিস্তান সরকারের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে বিলুপ্তপ্রায় জুম্ম জাতিকে রক্ষা করতে হলে রাজনীতিগতভাবে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া বিকল্প কোন রাস্তা নেই। তাই সক্রিয়ভাবে তিনি রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করেছিলেন। ১৯৬০ সালে জুম্ম জাতির ভাগ্যাকাশে চরমভাবে কালো মেঘের ঘনঘটা উপস্থিত হয়েছিল। কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী পুরোদমে অক্টোপাসের মতোই এগিয়ে এসেছিলো। তৎকালীন সময়ে জুম্ম জাতির জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব বিলুপ্তকরণে স্বৈরাচারী পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন। ফলশ্রুতিতে পাকিস্তান আমলে দীর্ঘ দুই বছর যাবত তাকে কারাবরণ করতে হয়েছিল। তারপরও কি তিনি চুপ করে রইলেন? না, কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার পর ৬০ দশকের পুরো সময় ধরে তিনি জুম্ম জনগণকে রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ ও সচেতন করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। উগ্র ইসলামিক ধর্মান্ধ স্বৈরাচারী সরকার যতই জুম্ম জাতিকে ধ্বংস করার জন্য একটার পর একটা হীন ষড়যন্ত্র করছিলেন ততই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা দুনিয়ার সবচেয়ে প্রগতিশীল চেতনাকে অন্তরে লালন করে জুম্ম জাতির রক্ষাকবচ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ঘুমন্ত জুম্ম জাতিকে আধুনিক জগতের সভ্যতার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। জুম্ম সমাজ ধীরে ধীরে চিনতে লাগলো নিজের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব রক্ষা করার মুক্তির পথ। একজন সত্যিকার মহান নেতার কাজ মানুষকে ঘুম জাগানিয়ার গান শুনিয়ে জাগ্রত করা, তিনি তাই করেছিলেন। একদিকে ভোগবাদী সমাজের পশ্চাদপদ, ঘুঁণেধরা ও রক্ষণশীল সামন্তসমাজের অবশেষ, অপরদিকে উগ্র ইসলামিক ধর্মান্ধ স্বৈরাচারী পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর হীন ষড়যন্ত্র এইসবের কোনটিই প্রিয়নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে আটকিয়ে রাখতে পারেনি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের প্রিয়নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাও সেরকমই একজন নেতা ছিলেন, যিনি পাহাড়ের বুকে জুম্ম ছাত্র সমাজকে নিয়ে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তাঁর হাত ধরে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে লড়াই হয়েছিল, তাঁর হাত ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হয়েছে, তাঁর হাত ধরে ১৯৭২ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারি জুম্ম জনগণের একমাত্র কান্ডারি সংগঠন জনসংহতি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাঁর হাত ধরে প্রগতিশীল জুম্ম জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, তাঁর হাত ধরে চার দফা দাবি সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীনামা পেশ, তাঁর হাত ধরে বাংলাদেশের প্রথম ৭২-এর সংবিধানে জুম্ম আদিবাসীদের বাঙালিকরণের বিরুদ্ধে সংসদের ভেতরে-বাইরে লড়াই সংগ্রাম হয়েছিলেন, তাঁর হাত ধরে ১৯৭৩ সালে ৭ জানুয়ারি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির একমাত্র সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনী গঠিত হয়েছিল, তাঁর হাত ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ দুই যুগের অধিক সশস্ত্র লড়াই সংগ্রাম শুরু হয়েছিল এবং তাঁর হাত ধরে নিপীড়িত জুম্ম জনগণের একমাত্র মুক্তির আন্দোলনও শুরু হয়েছিল। অবশেষে ১৯৮৩ সালে ১০ নভেম্বর ক্ষমতালোভী জাতীয় বেঈমান, বিশ্বাসঘাতক গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র প্রিয়নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। এরা জুম্ম জাতির ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছিল। জুম্ম জাতির ইতিহাসে এই চার কুচক্রীদের নাম জাতীয় শত্রু হিসেবে চিরদিন লেখা থাকবে। এই জাতীয় শত্রুরা জীবিত থেকেও মৃত। কিন্তু প্রিয়নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মৃত্যুর পরও হয়নি তাঁর মৃত্যু। তিনি নিপীড়িত জুম্ম জনগণের কাছে অমর হয়ে যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকবেন। তোমাকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন।

> “আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি, সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে বাস করে আসছে। বাংলাদেশের বাংলা ভাষায় বাঙালিদের সঙ্গে আমরা লেখাপড়া শিখে আসছি। বাংলাদেশের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সবদিক দিয়েই আমরা একসঙ্গে একযোগে বসবাস করে আসছি। কিন্তু আমি একজন চাকমা। আমার বাপ, দাদা, চৌদ্দ পুরুষ–কেউ বলে নাই, আমি বাঙালি।
>
> *– মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*”

রাষ্ট্রীয়ভাবে বর্ণবাদ ঔপনিবেশিকতার দৃষ্টিভঙ্গিতে শাসিত পার্বত্য চট্টগ্রাম

নিপন ত্রিপুরা

বর্ণবাদ ও উপনিবেশিকতার কথা উঠলে, এখনো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভয়াবহ শোষণের ইতিহাসের কথা মনে পড়ে। আমাদের এই উপমহাদেশে ব্রিটিশ উপনিবেশ শুরু হয়েছিল রবার্ট ক্লাইভের হাত ধরেই। তার আগে থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন শুরু হলেও পলাশীর যুদ্ধের পর আসল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের গোড়াপত্তন ঘটে। পলাশী যুদ্ধের মূল ষড়যন্ত্রের হোতা রবার্ট ক্লাইভ অত্যাচারের প্রতীক। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের উপর সীমাহীন অত্যাচার করেছেন। তার নেতৃত্বে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি লুটপাট, হত্যা, দখল ও অত্যাচারে মেতে উঠেছিল। সে ইতিহাস ব্রিটেনের জনা কয়েক লোক জানলেও সিংহভাগ লোকের কাছে তিনি নায়কসে রবার্ট ক্লাইভের একটি ভাস্কর্য পশ্চিম ইংল্যান্ডের শ্রেসবেরিতে রয়েছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে আমেরিকা জর্জ ফ্লয়েডের হত্যাকাণ্ডের পর ববার্ট ক্লাইভকে ভারতবর্ষের লোকজনের উপর শোষণ, নিপীড়নের সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশকতার ইতিহাস টেনে এনে তার ভাস্কর্য সরানোর দাবি তুলেছেন শত শত মানুষ। তাঁদের দাবি হচ্ছে, উপনিবেশের কালো ইতিহাস কি এখনো ব্রিটেনের 'গর্ব' বয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত।

বাংলাদেশে বর্তমান সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রী জাহেদ মালেক একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন, হাসপাতালে অপারেশন হয় না, অপারেশন হয় চট্টগ্রামের পাহাড়ে। ৯ আগস্ট ২০২০ তারিখে স্বাস্থ্য মন্ত্রী জাহেদ মালেক এ কথাটি মুখ ফসকে বলুক আর স্বজ্ঞানে বলুক পাহাড়ের এক জুম্ম সেদিন লেখালেখির মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কেননা তার এ বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে সরকারের আসল দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। মাননীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ মুখ ফসকে হলেও আসল কথাটি বলার জন্য। পাহাড় মানে সরকার তথা রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি হল সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীর আস্তানা। সেখানে কোন মানুষ থাকে না। নিরাপত্তায় নিয়োজিত বাহিনী যেন প্রতিনিয়ত অপারেশনে ব্যস্ত থাকে। সরকারের সে ভূত বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠের উপরও চেপে বসেছে। তাই বেশিরভাগ বাঙালিও মনে করে পাহাড় মানে কেবল আনন্দ ও সন্ত্রাসীর আস্তানা। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম তখন 'পাহাড়ে সন্ত্রাসীরা থাকে, তারা নাকি বাঙালিদের কাটে মারে' এমন অদ্ভুত ধরনের প্রশ্ন অনেক বার মুখোমুখি হয়েছি। কি ভয়াবহ দৃষ্টিভঙ্গি! অথচ আমি যখন বলি সরকার জুম্ম জনগণের অধিকার দিতে না চাওয়ায় সেটিকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য মনগড়াভাবে বাঙালিদের মনে পাহাড়ী বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে যাতে সরকার জুম্ম জনগণের অধিকার দিতে জনগণে চাপে পড়তে না হয়। আর দেশের সরকার ব্যবস্থা কি আসলেই জনগণের কল্যাণে কাজ করছে? আপনি পার্বত্য চট্টগ্রামে ঘুরতে গিয়ে কতবার পাহাড়ীদের হামলার শিকার হয়েছেন? উল্টো নিরীহ পাহাড়ীদের বাড়িতে রাত কাটিয়ে, ঘরে খোরাকি যা আছে তা দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন নিয়ে নিরাপদে বাড়িতে ফিরেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা প্রায়ই বলতেন স্বাধীন বাংলাদেশের জমানায় এসেও পার্বত্য চট্টগ্রাম এখনো ওপনিবেশিক কায়দায় শাসিত শোষিত হচ্ছে। শাসকগোষ্ঠী জুম্ম জনগণকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য পার্বত্য এলাকাকে জুম্ম অধ্যুষিত এলাকা থেকে সামরিক ও মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করা হীন ষড়যন্ত্রে মত্ত সেই ১৯৭১ সাল থেকে।

শ্রী লারমার বক্তব্যের দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যায় টিভি বিজ্ঞাপনের কড়চায় ও বাংলা সিনেমার বদৌলতে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে খাগড়াছড়িতে পাঠিয়ে দিব, বান্দরবানে পাঠিয়ে দিব ইত্যাদি ইত্যাদি বাংলা সিনেমা নতুবা বিজ্ঞাপনের ডায়লগ আমরা হরহামেশায় দেখি। তাজা চায়ের বিজ্ঞাপন দিচ্ছে আমার ভাতিজার যদি চাকরি না হয়, আপনারে ওভারনাইট বান্দরবানে পাঠিয়ে দিব। এরকম হাতের নাগালে অসংখ্য বর্ণবাদী ও বৈষম্যমূলক বিজ্ঞাপন দেখি আমরা। পার্বত্য এলাকা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা এখান থেকে কিছুটা বোঝা যায়। কেউ কেউ খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করিয়ে বলতে পারে বিজ্ঞাপন বা বাংলা সিনেমার দৃশ্যগুলো কেবল মনোরঞ্জনের জন্য বাস্তবের সাথে মিল নাই তাই এসব নিয়ে মাথা ব্যাথার কোন কারণ নাই। খোদ সরকার যখন নিজেই এমন কাজ করে তাহলে তার উত্তর কে দিবে? সরকার নিশ্চয়ই মসকরা কিংবা কারো মনোরঞ্জন করার জন্য এসব বলেন না বা করেন না। বলতে চাই, এ ব্যবস্থা তো অনেক দিনের পুরনো। তবে সরকার আগের চেয়ে এখন পুরোদমে ঘুষখোর, দুর্নীতিবাজ, অসৎ, অর্থ, নারী-শিশু কেলেঙ্ককারীতে যুক্ত সরকারি আমলাদের এখন তিন পার্বত্য জেলায় জোর করে বদলি করছে। যাতে করে সে দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর ও বিভিন্ন

কেলেঙ্কারীতে জড়িত ব্যক্তিরা সহসাই পার্বত্য এলাকায় এমন সব অপকর্ম সম্পাদন করতে পারে।

সরকারের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রাম একটা পানিশমেন্ট জোন। তার প্রমাণ পাওয়া যায়, ৩১ মে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০১৬ পালনের মূল অনুষ্ঠানে প্রয়াত স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন, 'অনেক ডাক্তার আছেন যাঁরা সিগারেট খান, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে আমি ঘোষণা দিচ্ছি, যদি শুনি কোনো ডাক্তার সিগারেট খান, আমি তাঁর পোস্টিং বাতিল করে দেব, তাঁকে বান্দরবানে পাঠিয়ে দেব।'

স্বাস্থ্যসচেতন একজন নাগরিক হিসেবে এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে অন্যকে ধূমপান না করার বিষয়ে উৎসাহ তিনি দিতেই পারেন। এর সাথে বান্দরবানের সম্পর্ক টেনে আনাটা মনে করি সমতলে থাকলে নিয়মাফিক জীবন পার করতে হবে, পাহাড়ে গেলে ধূমপান থেকে শুরু করে যাবতীয় কিছু করার রাষ্ট্রীয় লাইসেন্স আছে।

আমি যখন খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজে পড়তাম তখন খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজে সমাজ বিজ্ঞানের কোন শিক্ষক ছিল না, কোনমতে জেলা সমবায় অফিসারকে দিয়ে সমাজ বিজ্ঞানের ক্লাসগুলো সম্পন্ন করা হত। কয়েকদিন পর জানতে পারি আমাদের কলেজের সমাজ বিজ্ঞানের এক নতুন শিক্ষক এসেছে। তার শিক্ষার পাঠদান পদ্ধতি, শিক্ষণ পদ্ধতি সবকিছু দেখে বুঝা যায়নি তিনি আসলেই শাস্তি স্বরূপ হিসেবে আমাদের কলেজে বদলি হয়ে এসেছেন। পরে সবাই জানতে পারে আমাদের ভদ্র শিক্ষক চট্টগ্রাম কলেজে থাকাকালীন সময়ে কলেজের এক শিক্ষার্থীকে কু-প্রস্তাব দেন। পরবর্তীতে ওই ছাত্রী কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দায়ের করলে, কলেজ কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। তদন্ত কমিটি ওই শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীকে কু-প্রস্তাবের প্রমাণ পায়। সেজন্য তার শাস্তি স্বরূপ খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজে বদলির ব্যবস্থা করেন। এ বিষয়টি জানার পর কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থীরা মিলে কলেজ অধ্যক্ষের কাছে তাকে ফেরত পাঠানর দাবি তুললে পরে অধ্যক্ষ মহোদয় তাকে ফেরত পাঠান। কয়েক বছর আগে নোয়াখালীতে এক স্কুল ছাত্রীকে যৌন হয়রানি দায়ে অভিযুক্ত শিক্ষককে খাগড়াছড়িতে বদলি করা হয়েছিল। তাকে অন্য কোন জায়গায় বদলি করার জন্য খাগড়াছড়িতে প্রতিবাদ উঠেছিল। প্রতিবাদ শুরু হয়েছে খোদ পার্বত্যাঞ্চল থেকেই। ২০১৬ চুয়াডাঙ্গার দর্শনার উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রে রডের বদলে বাঁশ ব্যবহার করার জন্য খাগড়াছড়িতে বদলি করা হয়েছিল। তবে খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কংজরী চৌধুরীর প্রবল আপত্তির মুখে বহুল আলোচিত 'বাঁশ পিডি' সাদেক ইবনে শামছ সেখানে যোগ দিতে পারেননি। সেটিও ছিল সেই পরিচিত 'পানিশমেন্ট ট্রান্সফার'।

নানা অপরাধের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে বদলি হয়ে আসা বিভিন্ন দপ্তরের সামরিক বেসামরিক আমলা, কর্মকর্তারা পাহাড়ে এসে পাহাড় দখল, ভূমি বেদখল, নারী ধর্ষণ ও সাম্প্রদায়িক হামলা মতন জঘন্য ঘটনায় নিজেদের জড়াচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির তথ্য ও প্রচার বিভাগের অনিয়মিত প্রকাশনা জুম্মবার্তা (নভেম্বর-জানুয়ারি ২০১৮) মাধ্যমে জানা যায়, বাংলাদেশের সাবেক মন্ত্রী পরিষদ সচিব শফিউল আলমের নির্দেশে তার তিন ভাই (১) ফরিদুল আলম (২) ছুরত আলম (৩) জহুর আলম নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুনধুম ইউনিয়নের ৬৮ নং রেজু মৌজার ১০০ পাহাড়ী ও বাঙালির প্রায় ১০০ একর ভূমি দখল করে নিয়েছিল। শুধু তারা বান্দরবানে থানচি, চিম্বুক, আলীকদম, লামা, নাইক্ষ্যংছড়ি এলাকায় জুম্মদের হাজার হাজার জমি, ভূমি ও পাহাড় সরকারি বেসরকারি আমলাদের কব্জায় ইতোমধ্যে চলে গিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টির জন্য এদের ভূমিকাও কোন অংশে কম না।

২০১৭ সালে লংগদুতে সাম্প্রদায়িক হামলার সময় সেটেলারদের কর্মসূচিতে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সংহতি বক্তব্য ও তার কিছুক্ষণ পর পাহাড়ীদের গ্রামে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা চালিয়ে প্রায় ২৫০টির বেশি ঘরবাড়ি পুড়ে দেওয়া। এর প্রেক্ষিতে সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনী হামলা না ঠেকিয়ে, চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখাটা আরও বেশি প্রমাণ করে তথাকথিত নিরাপত্তার লেবাস লাগিয়ে কারা সন্ত্রাসের আসল মদদদাতা ও সাম্প্রদায়িক হামলার কুশিলব।

আমার মনে পড়ে, বিজিবির একটি মনগড়া রিপোর্টের ভিত্তিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৭ জানুয়ারি ২০১৫ পার্বত্য চুক্তি পরবর্তী পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য ১১টি নিষেধাজ্ঞা জারি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর ৫ নাম্বার সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, কোন দেশি-বিদেশি ব্যক্তি/ সংস্থা কর্তৃক পার্বত্য অঞ্চলে উপজাতীয়দের সাথে সাক্ষাৎ কিংবা বৈঠক করতে চাইলে স্থানীয় প্রশাসন এবং সেনাবাহিনী/ বিজিবির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে' এর অর্থ দাঁড়ায় যদি পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন আদিবাসী তার বিদেশী বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে কিংবা কথা বলতে চাইলে অথবা আদিবাসীদের মানবাধিকার নিয়ে কাজ করতে চাইলে স্থানীয় প্রশাসন বা বিজিবির প্রতিনিধিকে সঙ্গে নিয়ে কথা বলতে হবে।

আদিবাসীর সঙ্গে কথা বলতে গেলে এটা করতে হবে, কিন্তু যদি ওখানে বাঙালির সঙ্গে কথা বলতে যান কিংবা মৌলবাদী

সংগঠন সম-অধিকার আন্দোলন বা উগ্রবাদী সংগঠনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান, তাহলে কারও উপস্থিতি বা মনিটরিং লাগবে না। এটা তো অ্যাডলফ হিটলারের সিদ্ধান্তের কথা মনে করিয়ে দেয়, যেখানে কোনো ইহুদি কোনো জার্মানের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন না। কতটা সাম্প্রদায়িক হলে এ রকম নির্লজ্জ বিদ্বেষপূর্ণ ও বৈষম্যমূলক একটা নির্দেশনা আসতে পারে।

বৈষম্য পাহাড়ে কতটা প্রকট, তা এই সিদ্ধান্তে সহজে অনুমেয়। দেশপ্রেম কি শুধু প্রশাসনিক কর্মকর্তা কিংবা সেনাসদস্য বা বিজিবি সদস্যদের আছে? আদিবাসীদের কি দেশপ্রেম নেই? এ নির্দেশনা নিয়ে দেশে-বিদেশে ব্যাপক সমালোচনা আলোচনা হলেও বৈষম্যমূলক ও বর্ণবাদী এ নির্দেশনাটি এখনো পাহাড়ে চালু আছে। আরেক দিকে আদিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য রক্ষাকবচ আইনগুলো লঙ্ঘন করেই চলছে। তার দিকে সরকারের কোন নজর নাই।

এরকম আরও ভূড়ি ভূড়ি বৈষম্যমূলক ও বর্ণবাদী বক্তব্য এবং বদলির নজির আছে। তাই বলতে পারি তিন পার্বত্য জেলা এখনো উপনিবেশিক ও বর্ণবাদীর কায়দায় শাসিত হচ্ছে। অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের এক ধরনের শাসন, বাংলাদেশের বাকি জেলাগুলোতে আরেক ধরনের শাসন প্রচলিত। সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার প্রথম আলোর কাছে স্বীকার করে বলেছেন, বদলিকে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ধরা যায় না। ছোটখাটো অপরাধের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে দুর্গম কোনো স্থানে বদলির বিষয়টি প্রথা হিসেবে চালু আছে (১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭)।

কে বলবে বর্তমান অস্ট্রেলিয়া নামক জায়গাটি আদিবাসীদের ছিল। খুব বেশি দিনের নয় দুই শতাব্দীরও বেশি সময় আগে ১৭৮৮ সালের ২৬ জানুয়ারি দেশটিতে প্রথম ব্রিটিশ নৌবহর নোঙ্গর করেছিল। শ্বেতাঙ্গরা অস্ট্রেলিয়ায় আসার পর দেশটির আদিবাসীরা নজিরবিহীন গণহত্যা, বাস্তুভিটা থেকে স্থায়ীভাবে উচ্ছেদ, বৈষম্য এবং ভূমি দখলের শিকার হয়। তারপর থেকে প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারি অস্ট্রেলিয়া সরকার একে অস্ট্রেলিয়ার দিবস হিসেবে পালন করা হয়। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা এ দিনটিকে অস্ট্রেলিয়া দিবসের বদলে প্রতিবাদ জানিয়ে শোক এবং হত্যা দিবস হিসেবে দিনটি পালন করে থাকে। তাদের এ প্রতিবাদ মিছিল বছরের পর বছর বড় হচ্ছে। আদিবাসীদের এ ন্যায্য আন্দোলনে যুক্ত হচ্ছে অসংখ্য সচেতন তরুণ–তরুণী ও প্রগতিশীল মানুষ। আদিবাসীদের দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনের ফলে অস্ট্রেলিয়া সরকার বাধ্য হয়ে ভূমি অধিকার থেকে শুরু করে সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকার সমুন্নত রাখতে বদ্ধপরিকর। অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনও এখন আদিবাসীদের অধিকারের বিষয়ে সর্বদা সোচ্চার। সরকার রাষ্ট্র এ করুণ ঐতিহাসিক সত্যকে চাপা দিয়ে রাখলেও বেশি বছর চাপা দিয়ে রাখতে পারেনি। এ করুণ সত্যতার ইতিহাস এখন অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকের মুখে মুখে। অন্তত দেরিতে হলেও জেনেছে যে আদিবাসীদের হত্যা করে এ নগর সভ্যতা অস্ট্রেলিয়া গড়ে তোলা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা এখন ভূমি অধিকার, রাজনীতি অধিকার, সাংস্কৃতিক অধিকার, অর্থনীতির অধিকার অন্তত সমানতালে ভোগ করে। পূর্বে আদিবাসীদের উপরে সকল অত্যাচারের ঘটনায় অস্ট্রেলিয়া সরকার ২০০৮ সালে সংসদে সরকাররিভাবে আদিবাসীদের কাছে ক্ষমা চেয়ে সমান অধিকার, সুযোগ সুবিধা দেয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। ১৯৯৮ সাল থেকে প্রতি বছর অস্ট্রেলিয়া সরকার ২৬ মে জাতীয়ভাবে সরি দিবস পালন করে।

সাম্রাজ্যবাদীদের মোড়ল আমেরিকার নামে এককালে কোন দেশই ছিল না। ভূমিপুত্র রেড ইন্ডিয়ান আদিবাসীদের হত্যা করে, ভূমি দখল করে আমেরিকা নামক দেশ গঠন করা হয়েছে। আমেরিকার বুর্জোয়া সরকার যতই আদিবাসীদের হত্যার ইতিহাস চাপা দিয়ে রাখুক না কেন সত্য তার আপন ঠিকানায় বেরিয়ে এসে সবাইকে জানান দিয়েছে। এ প্রজন্মের আমেরিকার সকল নাগরিক সঠিক ইতিহাস জেনেছে। তাই তো এখন আমেরিকায় বর্ণবাদের বিরুদ্ধে কালো-ধলো সবাই মিলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। সারা বিশ্বের মানুষ জানে কলম্বাসই আমেরিকা আবিষ্কারক, কিন্তু জর্জ ফ্লয়েডের হত্যাকাণ্ডের পর কলম্বাসকে আদিবাসীদের হত্যার অন্যতম আসামী বানিয়ে তার মূর্তি পর্যন্ত ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। কেননা তিনি আদিবাসীদের পরোক্ষ হত্যাকারী এবং তার পথ ধরে বনিকরা এসেই আদিবাসীদের জায়গা দখল করেছিল। শুধু কলম্বাসের নয়, আরও অনেক বর্ণবিদ্বেষী আমেরিকান নেতা ও ব্যবসায়ীর মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। আন্দোলন চলমান রয়েছে 'ব্ল্যাক লাইভ ম্যাটার্স' ব্যানারে।

দ্বীপরাষ্ট্র তাইওয়ানের আদিবাসী সম্প্রদায়ের কাছে সরকারিভাবে ক্ষমা চেয়েছেন দেশটির তৎকালীন ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট তাই ইং-ওয়েন। তাইওয়ানের স্বীকৃত ১৬টি আদিবাসী গোষ্ঠীর নেতাদের সাথে কথোপকথনকালে প্রেসিডেন্ট তাই বলেছিলেন, একত্রে সামনে এগিয়ে যাওয়ার আগে তাইওয়ানকে অবশ্যই সত্যের মুখোমুখি হতে হবে। গত ৪শ বছর ধরে যতগুলো বিদেশি শাসকরা তাইওয়ানে এসেছে তারাই নির্দয়ভাবে আদিবাসীদের আঘাত করেছে। তাদের উপর সামরিক অত্যাচার করেছে, কেড়ে নিয়েছে বাপদাদার বসতভিটা ও জমি। এই অপরাধের জন্য সাধারণ মৌখিক ক্ষমা চাওয়া মোটেই পর্যাপ্ত না।' তবু তিনি আদিবাসীদের প্রতি

অঙ্গীকার করে বলেছিলেন, আদিবাসীরা যাতে তাদের বিষয় সম্পত্তি ও সংস্কৃতিগত অধিকার ফিরে পায় সেটা তার সরকার নিশ্চিত করবে। তিনি আরও বলেন, এই উপলক্ষে ঐতিহাসিক বিচারক কমিটি গঠন করা হবে।

বহু আগে আন্দামান দ্বীপে রাজবন্দীদের পাঠানো হতো। আন্দামানে বসবাসই ছিল তাঁদের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি। বাংলাদেশেও সরকারি চোখে একটি আন্দামান দ্বীপ আছে, সেটি সাধারণ জনগণ কিছুটা জানলেও সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তাদের কাছে একদম জানা বিষয়। আর বাংলাদেশে সরকারের প্রমাণিত দুর্নীতিগ্রস্ত কিংবা 'সরকারের কথা না শোনা' কর্মকর্তাদের শাস্তিস্বরূপ পাঠানো হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে। সন্দেহ নেই, এটি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি নেতিবাচক ধারণারই ফল।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিতরে যে বর্ণবাদী ও উপনিবেশিকতায় কায়দায় যে শাসন শোষণ চলছে সে ধারাতা বুঝতে আর কিছু আলাপ করা যাক, পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী তথাকথিত সন্ত্রাসীদের ধরার নাম করে রাত-বিরাতে জুম্মদের ঘুম হারাম করে অন্যায়ভাবে অপারেশন পরিচালনা করে তার বেশি নিশ্চুপ, পক্ষপাতমূলক আচরণ করে যখন সেটেলার কর্তৃক জুম্ম নারী ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ভূমি বেদখল, জুম্মদের উচ্ছেদ করা হয়। আজ পর্যন্ত এ রকম কোন নজির পাওয়া যাবে না যে সেটেলার কর্তৃক দখল হওয়া এক জুম্ম ব্যক্তির ভূমি নিরাপত্তা বাহিনী দখল মুক্ত করেছে। এ অবস্থায় জুম্মদের জীবনমানের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে সরকার জুম্ম জনগণের সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ করে ১/১১/২০১৮ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জুম্মদের জায়গা-জমি দখলকারী, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা সৃষ্টিকারী সেটেলারদের সুরক্ষার জন্য নির্দেশনা জারি করা হয়। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের উপর শাসকগোষ্ঠী, রাষ্ট্র ও নিরাপত্তা বাহিনী কি ভয়াবহ আকারে বর্ণবাদী আচরণ করছে।

এখন করোনার সময়। আদিবাসীরা সরকার কর্তৃক ঘোষিত লকডাউনের আগে তাদের স্ব স্ব ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান দিয়ে করোনা থেকে বাঁচতে আগেবাগে পাড়া বা গ্রাম লকডাউন করে রেখেছিলেন। এতে করে পুরো বাংলাদেশে আদিবাসীদের করোনায় আক্রান্ত সংখ্যাটিও খুবই নগণ্য। সরকার আদিবাসী এ ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানকে আমলে নিয়ে কাজে লাগাতে পারত কিন্তু উগ্র সাম্প্রদায়িক, অগণতান্ত্রিক সরকার আমলে তো নেয়নি বরং এ করোনায় সাজেককে জুম্মদের জায়গা ও চিম্বুকে জুম্মদের জায়গা দখল করে মসজিদ ও পর্যটন নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে।

উল্টো দেখেছি ভূমিদস্যু মেরিডিয়ান কোম্পানির হয়ে পুলিশ লামা উপজেলার লাংকুম পাড়ার লকউাউনের গেট ভেঙে দেয়ার নজির দেখেছি। অথচ জনস্বাস্থ্যবিদ আবু জামিল ফয়সাল আদিবাসীদের প্রথাগত জ্ঞানকে স্বীকার করে প্রথম আলোকে বলেন, এসব প্রথা ও প্রাচীন জ্ঞান মোটেও ফেলনা নয়। এর চর্চা দরকার সরকারিভাবে। এটি আমাদের সার্বিক শিক্ষার জগতে নতুন সংযোজন ঘটাতে পারে।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কটু ইতিহাসের কথা সবাই জানে। তাদের সে শাসনের ইতিহাস এতটাই বর্বর ও শোষণীয় ছিল যে সুদূর ব্রিটেনে বসে সে শোষণের মাত্রাটা বুঝার উপায় ছিল না। সে শোষণের ধার সমাজের মধ্যে এমনিভাবে ঢুকে গিয়েছিল কেউ একটু পাকনামি কথা বললে মানুষ বলে একদম ব্রিটিশদের মতন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার আজো সে বর্বর ইতিহাস মানতে নারাজ।

ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ নিয়াল ফাগুনসন তো বলেই দিয়েছেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বৈশ্বিক কল্যাণের জন্য ভালো ছিল। এমনকি ব্রিটেনের স্কুলকলেজের ইতিহাসের পাঠ্যক্রমে ব্রিটিশ উপনিবেশকে দেখানো হয় দাসপ্রথার বিলুপ্তির কারণ হিসেবে, শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মূলে রেলপথ, ব্রিজ নির্মাণসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নে এবং সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণসহ আরও অনেক মহৎ কাজের কারণ হিসেবে। যদিও তাদের এই মনোহরি দাবি ভারতবর্ষেও লোকজনের কাছে ধোপে টিকবে না। খোদ ব্রিটেনে অনেকেই বিষয়টিকে মানতে রাজি নন বহু আগে থেকে।

ভারতের সাবেক মন্ত্রী, রাজনীতিবিদ, জাতিসংঘের সাবেক কূটনৈতিক এবং লেখক শশী থারুর 'এন এরা অব ডার্কনেস' (২০১৬) নামে একটি বই লিখেছেন। বইখানা পরে ব্রিটেন থেকে 'ইনগ্লোরিয়াস এম্পায়ারড হোয়াট দি ব্রিটিশ ডিড টু ইন্ডিয়া' (২০১৭) নামে প্রকাশিত হয়। তাঁর মতে, ভারতবর্ষ শাসনকালে ব্রিটিশরা যা করেছিল তা রীতিমতো দানবীয় অপরাধ। তিনি মনে করেন, ব্রিটেনের উপনিবেশবাদের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য তাদের (ব্রিটেন) ভারত উপমহাদেশের কাছে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাওয়া।

বস্তুত শাসকগোষ্ঠী তথা সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার প্রতি আন্তরিক নয়। তাই তো তারা এই রাজনৈতিক সমস্যাকে সমাধান না করে, ব্রিটিশদের মতন অর্থনীতি, সাংস্কৃতিক ও উন্নয়নের বাহাস লাগিয়ে আসল সমস্যাকে আড়াল করছে। ব্রিটিশদের মতন উপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে মূল্যায়ন করছে বলেই এম এন লারমা দাবি সেদিন উপেক্ষিত হয়েছিল। সংবিধানেও সবাইকে বাঙালি বানাতো না। ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চুক্তি ২৩ বছর পেরিয়েও অবাস্তবায়িত থেকে না যেত। উপরন্তু সমস্যাকে সামরিক শাসনের কারণে আরও গভীরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যাকে উন্নয়নের প্রলেপ দিলেন ওবায়দুল

সজীব চাকমা

সম্প্রতি আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে শান্তির যে সুবাতাস শেখ হাসিনা ছড়িয়ে দিয়েছেন, তার পথ ধরেই এগিয়ে যাচ্ছে সম্ভাবনাময় পার্বত্য এলাকা। দুর্গম পাহাড়ে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দেয়ার পাশাপাশি শেখ হাসিনা এখন উন্নয়নের স্বর্ণদুয়ার খুলে সংকটকে সম্ভাবনায় রূপ দিয়েছেন।' (সূত্রঃ বাংলাদেশ প্রতিদিন ও দৈনিক যুগান্তর)।

তিনি আরও বলেছেন, 'শান্তিচুক্তির অধিকাংশ শর্ত ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। ভূমি-সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের সমস্যাও নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ...সরকার এ অঞ্চলের মানুষের জীবন ও জীবিকার স্বকীয়তা বজায় রেখে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এগিয়ে যাচ্ছে।'

গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ আওয়ামীলীগের গুরুত্বপূর্ণ এই নেতা ও মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তার বাসভাবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলা ও কক্সবাজারের সড়ক উন্নয়ন বিষয়ক এক সভায় এসব কথা বলেন।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা হচ্ছে একটি রাজনৈতিক সমস্যা। এই রাজনৈতিক সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবেই সমাধান করতে হবে। রাজনৈতিকভাবে সমাধান না করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে কখনোই এই সমস্যাকে সমাধান করা সম্ভব হয়। এতে বরঞ্চ সমস্যাটা আরো জটিল হতে বাধ্য এবং হচ্ছেও তাই। তাই ওবায়েদুল কাদেরের এই 'উন্নয়নের স্বর্ণদুয়ার খুলে দেয়া' বা 'শান্তির সুবাতাস বইয়ে দেয়া'র বিষয়টি প্রথমত পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের প্রক্রিয়া কতটুকু এগিয়েছে তার আলোকে; দ্বিতীয়ত এসব উন্নয়ন কার্যক্রমে পার্বত্যবাসীর, বিশেষ করে জুম্ম জনগণের ভূমি ও সাংস্কৃতিক অধিকার এবং পার্বত্যাঞ্চলের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য কতটুকু বিবেচনায় নেয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা জরুরি।

বলাবাহুল্য, মন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের এইসব বক্তব্য পাহাড়ের মানুষদের, বিশেষ করে আদিবাসী জুম্মদের খুশি করা তো দূরের কথা যারপরনাই হতাশ ও বিরক্তির সৃষ্টি করেছে। তার এই বক্তব্য পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তব পরিস্থিতিকে যেমনি তুলে ধরে না, তেমনি নিপীড়ন ও বঞ্চনার শিকার জুম্মদের অধিকার নিয়ে উপহাস করার সামিলও বটে। দীর্ঘ প্রায় ২৩ বছরেও পার্বত্য চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়িত না হওয়ার প্রেক্ষাপটে তার এমন উপচেপড়া আত্মতুষ্টি ও আত্মপ্রশংসা প্রকাশ বস্তুত পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের প্রকৃত অবস্থা ও চুক্তি স্বাক্ষরকারী জুম্ম জনগণের সাথে প্রতারণা বৈ কিছু নয়।

পাহাড়ের মানুষ এবং তাদের শুভাকাঙ্খী যারা আছেন, তারা জানেন বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি কী শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় উপনীত হয়েছে। পাহাড়ে কী ধরনের উন্নয়ন হচ্ছে, কাদের উন্নয়ন হচ্ছে! তারা জানে, সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়নের নামে কীভাবে এখানকার ভূমির সন্তান আদিবাসী জুম্মদের প্রতিনিয়ত উচ্ছেদ ও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। আজকে পাহাড়ের সাধারণ মানুষ জানে, কিভাবে চুক্তির পূর্ববর্তী সময়ের ন্যায় রাষ্ট্রীয় বাহিনী দিয়ে একদিকে জুম্মদের বাক স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকার কেড়ে নেয়া হচ্ছে, অপরদিকে তাদের উপর দমন, পীড়ন ও নির্যাতনের ষ্টিমরোলার চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। একদিকে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বাহিনী ও সরকারী মহলের লোকদের দিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে, অপরদিকে বাঙালি সেটেলার ও তাদের বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সংগঠন এবং সংস্কারপন্থী ও ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) ইত্যাদি সরকারের সৃষ্টি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী লেলিয়ে দিয়ে জুম্মদের উচ্ছেদ ও ধ্বংসের ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বস্তুত পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়ন ও পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন নিয়ে আওয়ামীলীগ নেতা ও মন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের উক্ত বক্তব্য শুধু গতানুগতিকই নয়, বাস্তববিবর্জিত, ডাহা মিথ্যা ও গভীর প্রতারণামূলকও বটে। এই ধরনের বক্তব্য পাহাড়ের মানুষের জন্য আশার বাণী তো নয়ই, বরং 'অশনি সংকেত' ছাড়া কিছু নয়। কারণ এধরনের বক্তব্য সমস্যাকে অস্বীকার করে সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে বরং ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সমস্যাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার ইঙ্গিতই বটে।

সরকার নিজেই চুক্তি লংঘন করছে এবং চুক্তির উল্টো পথে হাঁটছে

মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে শান্তির সুবাতাস শেখ হাসিনা ছড়িয়ে দিয়েছেন' এবং 'শান্তিচুক্তির অধিকাংশ শর্ত ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে' বলে যে বয়ান দিয়েছেন, বাস্তবে তার কোনো ভিত্তি আছে বলে মনে

করা যায় না। পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান, এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের লক্ষে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও শান্তিবাহিনীর মধ্যে সংঘাত বন্ধ করে বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও বিগত দীর্ঘ ২৩ বছরেও সেই চুক্তি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করেনি সরকার। পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের কথা বাদ দিলেও যে মৌলিক বিষয়গুলোর উপর চুক্তির কাঠামো নির্মিত হয়েছে, সেই মৌলিক বিষয়ের একটিও বাস্তবায়ন করেনি সরকার।

এমনকি চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও এ পর্যন্ত সরকারের কোন প্রকার আন্তরিক উদ্যোগ দৃশ্যমান হয়নি। শুধুমাত্র করছি, করবো বলেই দুই যুগ পার করে দিয়েছেন। আর 'শান্তিচুক্তির অধিকাংশ শর্ত ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে' বলে যে বক্তব্য মন্ত্রী দিয়েছেন, সেটাও শুভঙ্করের ফাঁকি ছাড়া কিছু নয়। কেননা, সরকারের হিসাবে দেখা যায় যে, যে

> মন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের ..এই বক্তব্য পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তব পরিস্থিতিকে যেমনি তুলে ধরে না, তেমনি নিপীড়ন ও বঞ্চনার শিকার জুম্মদের অধিকার নিয়ে উপহাস করার সামিলও বটে।

ধারাগুলো বাস্তবে আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে অথবা কেবলমাত্র আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে কার্যকর করা হয়নি, সেই ধারাগুলোও সরকার সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে বলে মিথ্যা প্রচার করে থাকে। এক্ষেত্রে জনসংহতি সমিতির বিশ্লেষণ করে ও উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, সরকার প্রকৃতপক্ষে চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে মাত্র ২৫টি ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করেছে এবং অবশিষ্ট ৪৭টি ধারার মধ্যে কিছু ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে, অধিকাংশ সম্পূর্ণভাবে অবাস্তবায়িত অবস্থায় রাখা হয়েছে।

বিগত ২৩ বছরেও পার্বত্য সমস্যার অন্যতম মূল সমস্যা ভূমি সমস্যার সমাধান হয়নি। চুক্তি অনুযায়ী ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কথা থাকলেও ভূমি বিরোধেরও সুরাহা হয়নি, একজন জুম্মও তাদের বেদখল হওয়া ভূমি ফেরত পায়নি। চুক্তি অনুযায়ী ৬টি সেনানিবাস বাদে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সকল অস্থায়ী সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার করার শর্ত থাকলেও চার শতাধিক ক্যাম্প এখনো বহাল তবিয়তে সক্রিয় রয়েছে। ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও হাজার হাজার অভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু পরিবারকে তাদের জায়গা-জমি ফেরত দিয়ে পুনর্বাসনের কথা থাকলেও অধিকাংশ শরণার্থী এখনও তাদের জায়গা ফেরত পায়নি এবং অভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু একটি পরিবারও তাদের জায়গা ফেরত ও পুনর্বাসনের সুবিধা পায়নি।

পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন কার্যকর করা হয়নি। পরিষদ সমূহের নির্বাচন বিধিমালা ও ভোটার তালিকা বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়নি। এখনও পর্যন্ত স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে ২৩ বছরেও আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা যায়নি। চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য সকল আইন সংশোধন ও হালনাগাদ করা হয়নি। চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম (উপজাতি) অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার বিধান থাকলেও তার কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশকারী বাঙালি সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরের স্ব স্ব জায়গায় পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

উল্লেখ্য যে, বিগত ১২ বছর ধরে একনাগাড়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন এই সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলেও এই সময়কালে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলার অবশিষ্ট বিষয়গুলো হস্তান্তরের উদ্যোগও দেখা যায়নি। এমনকি এই সময়কালে সরকার তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে কার্যত অকার্যকর করে রেখেছে এবং চুক্তি স্বাক্ষরকারী জনসংহতি সমিকে দূরে ঠেলে দিয়েছে।

অপরদিকে সরকার শুধু চুক্তি বাস্তবায়নের কার্যক্রম বন্ধ রেখেছে তা নয়, সরকার নিজেই চুক্তি লংঘন করে একের পর এক চুক্তি বিরোধী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে এবং চুক্তির উল্টো পথে হেঁটে চলেছে। এমনকি সরকার এই ধরনের চুক্তিবিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে মদদও দিয়ে চলেছে। বলতে গেলে সরকার শুরু থেকেই চুক্তি লংঘনের অপচেষ্টা শুরু করে। ২০০১ সালে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন প্রণয়নের সময়ই সরকার নগ্নভাবে চুক্তি লংঘনের নজির সৃষ্টি করে। সেসময় সরকার জনসংহতি সমিতি ও আঞ্চলিক পরিষদের সাথে যথাযথ পরামর্শ ব্যতিরেকে চুক্তির সাথে সাংঘর্ষিকভাবে ভূমি কমিশন আইন প্রণয়ন করে। পরবর্তীতে বহু আন্দোলনের পর প্রায় ১৫ বছর পর ২০১৬ সালে সরকার চুক্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভূমি কমিশন আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু আইন করার পরও দীর্ঘ ৪ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে

অথচ এখনও পর্যন্ত ভূমি কমিশন আইনের কার্যবিধিমালা প্রণয়ন করেনি সরকার। ফলে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিচারিক কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি।

চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত যেকোনো ধরনের আইন প্রণয়ন বা গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হাতে নিতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের মতামত বা পরামর্শ গ্রহণের বিধান রয়েছে। কিন্তু সরকার সেসবের তোয়াক্কা না করে ২০১৪ সালে একতরফাভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন প্রণয়ন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনসংশোধন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন ও স্থাপন, মেডিকেল কলেজ স্থাপন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। এইসব আইন ও বিধানে এবং নীতিমালায় পার্বত্য চুক্তি ও স্থানীয় জনগণের স্বার্থ ও অধিকারকে ব্যাপকভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ স্থাপন করতে গিয়ে সরকার জোরপূর্বক স্থানীয় জনগণের ভূমি অধিগ্রহণ করে।

চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন, আইনশৃঙ্খলা ও সাধারণ প্রশাসন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ সংস্থা আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান করার বিধান থাকলেও সরকার সেসব বিধানকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদ বিশেষ শাসনব্যবস্থা পাকাপোক্ত হতে না পারায় এবং খোদ সরকারি বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তা লংঘনের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন মহল কর্তৃক উন্নয়নের নামে জুম্মদের ভূমি বেদখল ও স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ কার্যক্রম উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

উন্নয়নের স্বর্ণদুয়ার নয়, উন্নয়নের মরণফাঁদ

সরকার একদিকে চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বন্ধ রেখেছে এবং চুক্তির বিভিন্ন ধারা ও চুক্তি মোতাবেক প্রণীত আইন লংঘন করে চলেছে, অপরদিকে একতরফাভাবে চুক্তির সাথে বিরোধাত্মক ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী তথাকথিত বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। চুক্তি অনুযায়ী স্থাপিত আঞ্চলিক পরিষদকে ঠুঁটো জগন্নাথ করে রেখে দিয়েছে এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে জনগণের জবাবদিহি বিহীন এবং সরকারী দলের লোকদের লুটপাটের এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। এছাড়া সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ নিজের দলের স্বার্থে এবং পার্বত্য চুক্তিকে উপেক্ষা করে চলেছে। ফলে এখানে যে কোনো উন্নয়ন প্রকল্পে জুম্ম জনগণ তথা স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকার ও স্বার্থকে পদদলিত করা হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের নামে যে বরাদ্দ দেয়া হয়ে থাকে, যে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে, সেই উন্নয়ন বরাদ্দ ও প্রকল্পের চাবিকাঠি জুম্মদের হাতে থাকে না এবং সেই উন্নয়নের সুফল জুম্মদের স্বার্থে পরিচালিত হয় না। বস্তুত চুক্তির মূল চেতনাকে পদদলিত করে আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদ এর মতামত, জুম্ম জনগণের স্বার্থ এবং অধিকারকে উপেক্ষা করে সরকার একের পর এক তথাকথিত এসব উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে।

ফলে মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে যে 'উন্নয়নের স্বর্ণদুয়ার খোলা হয়েছে' বলে বলছেন তা প্রকৃতপক্ষে আদিবাসী জুম্মদের জন্য নয়। পাকিস্তান সরকার যেভাবে উন্নয়নের নামে কাপ্তাই বাঁধ মরণ ফাঁদ তৈরি করেছিল, বর্তমান সরকারও স্বাক্ষরিত পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়ন বন্ধ রেখে এবং চুক্তি লংঘন করে জুম্মদের ধ্বংসের জন্য একের পর এক 'উন্নয়নের মরণফাঁদ' তৈরি করে চলেছে।

মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের উক্ত ভিডিও কনফারেন্সে তিন পার্বত্য জেলার সড়ক উন্নয়ন বিষয়ে উল্লেখ করেন, 'বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলার সীমান্ত ঘেঁষে প্রায় ৩১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে। এর মধ্যে ১০০ কিলোমিটার লিংক রোড এবং ২১৭ কিলোমিটার সীমান্ত বরাবর কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে।' বলাবাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদসহ জনমতকে উপেক্ষা করে, সর্বোপরি পার্বত্য চুক্তি ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনকে লংঘন করে সরকার ও সেনাবাহিনী একতরফাভাবে এইসব সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ হাতে নিয়েছে। জানা গেছে, এই সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলে শত শত জুম্ম পরিবারের আবাসভূমি, জুমভূমি বেহাত হবে এবং তাদের গড়ে তোলা অনেক বাগান-বাগিচা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এক সমীক্ষায় জানা যায় যে, কেবল রাজস্থলী-বিলাইছড়ি-জুরাছড়ি-বরকল-ঠেগামুখ সড়ক নির্মাণ করা হলে ১১৪ একর জমি অধিগ্রহণ করতে হবে, এতে ৫৬৪ পরিবার প্রভাবিত/ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ২৪১টি বাগান ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ১০টি সাংস্কৃতিক অবকাঠামো এবং ৩২টি পুকুর ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এছাড়া তিন পার্বত্য জেলায় নিয়োজিত সেনাবাহিনী, বিজিবি নিজেরাই চুক্তি লংঘন করে উন্নয়নের নামে স্থানীয় জুম্মদের শত শত একর ভূমি বেদখল ও উচ্ছেদ করে বিলাসবহুল পর্যটন ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, বান্দরবানের নীলগিরিতে স্থানীয় জুম্ম অধিবাসীদের উচ্ছেদ ও জীবন-জীবিকাকে বিপন্ন করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও সিকদার গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে চিম্বুক পাহাড়ে উচ্চাভিলাষী বিশাল পর্যটন কমপ্লেক্স প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যেখানে মূল হোটেল ভবনের সাথে

পর্যটকদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ১২টি পৃথক ভিলা ও আধুনিক ঝুলন্ত গাড়ি (ক্যাবল কার) থাকবে। জানা গেছে, তারই অংশ হিসেবে সেখানে পাঁচ তারকা ম্যারিয়ট হোটেল এবং বিনোদন পার্কের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। বস্তুত এভাবে উন্নয়নের নামে রাষ্ট্রীয় বাহিনী ও তাদের মদদপুষ্ট বিভিন্ন মহল কর্তৃক ইচ্ছেমত আইন ও স্থানীয় জনগণের মানবাধিকারকে পদদলিত করে বিভিন্ন পাহাড় ও ভূমি দখল করে জুম্মদের উচ্ছেদের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। অথচ প্রায়ই প্রচার করা হয়ে থাকে এসবই করা হচ্ছে নাকি পার্বত্য এলাকার মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে।

বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদও নিজেই অতিসম্প্রতি উন্নয়নের নামে পরিবেশের ক্ষতি করে, নির্বিচারে পাহাড় ধ্বংস করে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সড়ক নির্মাণ করে চলেছে।

বস্তুত উন্নয়নের নামে সাম্প্রতিককালে সরকার জুম্মদের উপর যে আগ্রাসন ও জবরদস্তি চালাচ্ছে, তা এক কথায় 'সর্বাত্মক আদিবাসী জুম্ম বিধ্বংসী ষড়যন্ত্র' বা এক গণবিরোধী ঔপনিবেশিক আগ্রাসন ছাড়া আর কিছু নয়। এসব জনবিচ্ছিন্ন উন্নয়নের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামকে জুম্ম শূন্য করে এ অঞ্চলকে সম্পূর্ণভাবে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করা।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতি বিস্ফোরন্মুখ

সরকার যতই শাক দিয়ে পঁচা মাছ বা কুলো দিয়ে মরা হাতি ঢাকার চেষ্টা করুক, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃত অবস্থাকে সে কখনোই আড়াল করতে পারবে না। কারণ পার্বত্য সমস্যার সমাধান, এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের কথা বলে যে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে সরকার, সেই চুক্তি বাস্তবায়ন না করে, জুম্ম জনগণকে বঞ্চিত করে এবং চুক্তি স্বাক্ষরকারী জনসংহতি সমিতিকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা করে কখনো স্থায়ীত্বশীল সমাধান, শান্তি ও উন্নয়ন আশা করা যায় না। সরকার ও রাষ্ট্রীয় বাহিনী বর্তমানে চুক্তি ও জুম্ম জনগণের সাথে প্রতারণা করে জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম জনগণকে আবার অস্তিত্ব রক্ষার কঠিন সংগ্রামের দিকে ধাবিত করছে। সরকার ও রাষ্ট্রীয় বাহিনী নিজেই পার্বত্য চুক্তির সাথে প্রতারণা করে শান্তির পায়রাকে গলা টিপে ধরেছে। তারা একদিকে বহিরাগত বাঙালি সেটেলারদের দিয়ে জুম্মদের ভূমি বেদখলসহ চুক্তিবিরোধী নানা ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে, অপরদিকে সংস্কারপন্থী ও ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক) সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে দিয়ে জুম্মদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের রাজত্ব বজায় রেখে চলেছে।

ফলে ওবায়দুল কাদের তার বক্তব্যে চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে 'দুর্গম পাহাড়ে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দেয়ার' যে কথা বলেছেন, সেটা কথার ফুলঝুরি ছাড়া কিছু নয়। সাম্প্রতিককালে উন্নয়নের নামে সরকারের যে উন্নয়ন আগ্রাসন, নিরাপত্তা ও সন্ত্রাসী দমনের নামে চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলনকারী জনসংহতি সমিতির নেতাকর্মী, সমর্থক ও সাধারণ জনগণকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে যেভাবে হত্যা, গ্রেপ্তার, দমন, পীড়ন ও নির্যাতন শুরু করেছে, তাতে সরকার 'শান্তির বার্তা' নয়, বরং 'হিংসার বার্তা'ই ছড়িয়ে দিচ্ছে পাহাড়ে। বস্তুত সরকার ও রাষ্ট্রীয় বাহিনী জুম্ম জনগণকে আজ যেভাবে নজিরবিহীন জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংকটের মুখে দাঁড় করিয়েছে তাতে পরিস্থিতি এক বিস্ফোরন্মুখ অবস্থায় উপনীত হয়েছে।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা, পরিস্থিতিকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা, সর্বোপরি পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম নির্বিঘ্নে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে আন্দোলনরত জুম্মদেরকে ক্রিমিনালাইজেশনের অংশ হিসেবে ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত বিগত ছয় মাসে সেনাবাহিনী, বিজিবি, গোয়েন্দা বাহিনী ও পুলিশ কর্তৃক ৭২টি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এই ৭২টি ঘটনায় ২ জনকে বিচার বহির্ভূত হত্যা, ২৭ জনকে অবৈধ গ্রেফতার, ৮ জনকে সাময়িক আটক, ২২ জনকে শারীরিক নির্যাতন ও হয়রানি, ৫৩টি বাড়ি তল্লাসী, ৩টি নতুন ক্যাম্প স্থাপন, সেনাবাহিনীর উন্নয়নে ১৬৭ পরিবার ক্ষতির মুখে পড়ার ঘটনা ঘটেছে।

আরও উদ্বেগজনক ব্যাপার হল, প্রাণঘাতি কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যেও সাম্প্রতিককালে প্রশাসনের সহায়তায় ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ও বহিরাগত ভূমিদস্যু কর্তৃক ভূমি জবরদখল, জুম্ম গ্রামবাসীদের নানাভাবে হামলা, হয়রানি ও উচ্ছেদকরণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ছয় মাসে বাঙালি সেটেলার কর্তৃক এই ধরনের ২৩টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এই ২৩টি ঘটনায় ৪ জন জুম্ম নারী ও শিশুর উপর সহিংসতা, জুম্মদের উপর ২টি সাম্প্রদায়িক হামলা, ভূমি জবরদখল কিংবা বেদখলের চেষ্টায় ৮১৮ পরিবার ক্ষয়ক্ষতির মুখোমুখী, জুম্ম গ্রামবাসীদের ৩,০২১ একর জায়গা জবরদখল, ভূমি বিরোধকে কেন্দ্র করে জুম্মদের বিরুদ্ধে ২টি মামলা দায়ের ও ২ জনকে গ্রেফতার এবং প্রায় ৫,০০০ একর রাবার বাগান পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

বলাবাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান সামগ্রিক পরিস্থিতি পার্বত্য চট্টগ্রামকে ও জুম্ম জনগণকে আবার ১৯৭৫ পরবর্তী যে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি ছিল, ঠিক সেই পরিস্থিতির দিকেই ঠেলে দিচ্ছে।

শেষ কথা

বস্তুত বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের পথ পরিহার করেছে এবং পূর্ববর্তী সামরিক সরকারগুলোর মতো সামরিক উপায়ে ও ডেভেলাপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যা সমাধানের পথ কার্যত বেছে নিয়েছে। সরকারের সেই ফ্যাসীবাদী ষড়যন্ত্রকে ধামাচাপা দিতে ও ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়েদুল কাদের 'উন্নয়নের স্বর্ণদুয়ার'-এর প্রলেপ দেয়ার অপচেষ্টা করেছেন।

এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ও উদ্বেগজনক, যে সরকার পার্বত্য সমস্যা রাজনৈতিকভাবে সমাধানের স্বীকৃতি দিয়ে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, সেই সরকারই আজ চুক্তি বাস্তবায়নের বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষর করে যে প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার গ্রহণ করেছেন, সেই প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলেই আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে অশান্তির দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। এটা আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, সংঘাতের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের কথা বলে চুক্তি স্বাক্ষরকারী সরকারই আজ সামরিক বাহিনী দিয়ে চুক্তি বিরোধী বিভিন্ন কার্যক্রম এবং জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে দমন-পীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে।

বলাবাহুল্য, বাস্তব অবস্থাকে অস্বীকার করে, এ বিষয়ে মিথ্যাভাষণ দিয়ে কখনো বাস্তব অবস্থার বাস্তব সমাধান পাওয়া যায় না। সরকারকে অবশ্যই চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং পার্বত্য সমস্যাকে সামরিক উপায়ে সমাধানের সহিংস পথ পরিহার করতে হবে। বস্তুত পার্বত্য চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নসহ জুম্ম ও স্থায়ী অধিবাসীদের অধিকার নিশ্চিতকরণ ছাড়া পার্বত্য সমস্যা সমাধানের কোন বিকল্প নেই। তাই সরকার ও মাননীয় মন্ত্রীকে আহ্বান জানাই, এসব মিথ্যাচার বন্ধ করুন, সত্য ও বাস্তব পরিস্থিতিকে তুলে ধরুন এবং সততা ও আন্তরিকতার সাথে চুক্তি যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করুণ। অন্যথায় ভবিষ্যতে যেকোনো পরিস্থিতির জন্য আপনরাই দায়ী থাকবেন।

> "আমি খুলে বলছি। বিভিন্ন জাতিসত্তার কথা যে এখানে স্বীকৃত হয়নি, সে কথা আমি না বলে পারছি না। আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী। আমি সেখানকার উপজাতীয় এলাকার লোক। সেখানকার কোন কথাই এই সংবিধানে নাই। যুগে যুগে ব্রিটিশ শাসন থেকে আরম্ভ করে সবসময় এই এলাকা স্বীকৃত হয়েছিল; অথচ আজকে এই সংবিধানে সেই কথা নাই। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি কীভাবে ভুলে গেলেন আমার দেশের কথা–পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা। এটা আমার বিস্ময়।"
>
> *– মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি: শেখ হাসিনা সরকারের প্রহসন ও প্রতারণা

প্রীতিবিন্দু চাকমা

আশি দশকে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলে আসছিল। তাই নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানে জেনারেল এরশাদ সরকারের পতনের পর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ আওয়ামী লীগকেই সমর্থন দিয়ে আসছিল। স্বভাবতই ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন আওয়ামীলীগ সরকারের সাথে যখন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, দেশবাসী ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়সহ জুম্ম জনগণ আশা করেছিল এবার বুঝি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান হতে চলেছে। শেখ হাসিনার প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে এই আশায় বুক বেঁধেছিল যে, এবার শত শত বছরের অবহেলা ও বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে জুম্ম জনগণ তার হৃত অধিকার ফিরে পাবে। কিন্তু পার্বত্য চুক্তির ২৩ বছরের মাথায় এসে জুম্ম জনগণের সেই প্রত্যাশা আজ সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে ব্যাপক ঢাকঢোল পিটিয়ে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের পরাকাষ্ঠা সেজে দেশবাসী ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সাক্ষী রেখে যে ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন, তিনি তা যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করলেন না। পার্বত্য চুক্তিতে যে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক অধিকার স্বীকার করে নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য তিনি যে রাজনৈতিক অঙ্গীকার করেছিলেন, তা তিনি বাস্তবায়নে কোনও উদ্যোগই নিলেন না। পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের নামে একের পর এক গালভরা বুলি ঠিকই আওড়ালেন, কিন্তু তা বাস্তবায়নে ধারে কাছেও গেলেন না। তাহলে তিনি যেই হোন না কেন, তার এই ভূমিকা বা আচরণকে রাজনৈতিক ভন্ডামি, প্রতারণা ও বেঈমানি ছাড়া আর কী বলার থাকে?

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রায় ২৩ বছর অতিক্রান্ত হতে চললো। তার মধ্যে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের ৫ বছর ও ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন ২ বছর বাদ দিলে চুক্তি স্বাক্ষরের পরে এ পর্যন্ত প্রায় ১৬ বছর ধরে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরকারী শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় রয়েছে। এই দীর্ঘ ১৬ বছরে সরকার পার্বত্য চুক্তির কম গুরুত্বপূর্ণ নানা ধারা-উপধারা বাস্তবায়ন করেছেন বটে, কিন্তু চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ নিলেন না। চুক্তির যে মৌলিক বিষয়সমূহের উপর পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধান নির্ভর করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বশাসিত বিশেষ শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে সেই মৌলিক বিষয়সমূহ রেখে দিলেন একেবারেই অবাস্তবায়িত অবস্থায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত মূল বিষয়সমূহের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণে আইনী ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা; পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বন ও পরিবেশ, পর্যটন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদিসহ রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও কার্যাবলী হস্তান্তর করা; নির্বাচন বিধিমালা ও ভোটার তালিকা বিধিমালা প্রণয়ন পূর্বক তিন পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা; 'অপারেশন উত্তরণ' নামক একপ্রকার সেনাশাসনসহ সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা; ভূমি কমিশনের মাধ্যমে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করে বেহাত হওয়া জুম্মদের জায়গা-জমি ফেরত দেয়া; ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের তাদের স্ব স্ব জায়গা-জমি প্রত্যার্পণপূর্বক পুনর্বাসন প্রদান করা; অস্থানীয়দের প্রদত্ত ভূমি ইজারা বাতিলকরণ; পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকরিতে জুম্মদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ করা; চুক্তির সাথে সঙ্গতি বিধানকল্পে ১৮৬১ সালের পুলিশ এ্যাক্ট, পুলিশ রেগুলেশন ও ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য অন্যান্য আইন সংশোধন; পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সেটেলার বাঙালিদের সম্মানজনক পুনর্বাসন করা ইত্যাদি অন্যতম। এসব মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে গড়িমসি করে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরকারী শেখ হাসিনা সরকার একে একে ১৬টি বছর ক্ষেপণ করেছে।

বস্তুত পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শেখ হাসিনা সরকারের প্রবঞ্চনা ও টালবাহানার প্রথম অপচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় চুক্তি মোতাবেক যখন ১৯৯৮ সালে এপ্রিল-মে মাসে জাতীয় সংসদে

তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণয়ন করা হচ্ছিল সেই সময়। কথা ছিল খসড়া আইনগুলোর উপর মতামত গ্রহণের জন্য প্রথমে জনসংহতি সমিতির নিকট পাঠানো হবে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে জনসংহতি সমিতির নিকট প্রেরণ না করে খসড়া আইনগুলো এপ্রিল মাসে সরাসরি জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়ে থাকে। দেখা গেলো, সেই আইনগুলোতে চুক্তির সাথে অন্তত চারটি বিরোধাত্মক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যেগুলো চুক্তিতে স্বীকৃত এখতিয়ার ও অধিকারকে মারাত্মকভাবে খর্ব করেছিল। এর বিরুদ্ধে জনসংহতি সমিতি তাৎক্ষণিকভাবে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। উভয়পক্ষে বিশেষ বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, উক্ত বিরোধাত্মক বিষয়সমূহ সংশোধন করা হবে। তা সত্ত্বেও সরকার কর্তৃক চারটি বিরোধাত্মক ধারার মধ্যে তিনটি সংশোধন করা হলেও উন্নয়ন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারাটি অসংশোধিত অবস্থায় থেকে যায়।

এরপর দেখা দেয় অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন নিয়ে শেখ হাসিনা সরকারের চুক্তি লঙ্ঘন। সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে অলিখিত চুক্তির মধ্যে অন্যতম একটি ছিল, অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ জনসংহতি সমিতি গঠন করবে। তদনুসারে জনসংহতি সমিতি অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যদের নামের তালিকা সরকারের নিকট পেশ করে। কিন্তু প্রস্তাবিত সদস্যদের মধ্যে অউপজাতীয় (বাঙালি) তিনজন সদস্যকে বাদ দিয়ে জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনা ছাড়া আওয়ামী লীগের মনোনীত অপর তিনজন অউপজাতীয় সদস্যদের সমন্বয়ে সরকার ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ অন্তর্বর্তী আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের গেজেট প্রকাশ করে। শেখ হাসিনা সরকারের এই চুক্তি বিরোধী কার্যকলাপের কারণে অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্বভার গ্রহণে অন্তত ৮ মাস পিছিয়ে পড়ে। এভাবেই শেখ হাসিনা সরকার চুক্তি ভঙ্গের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া শুরু করতে থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে ভারত-প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের ন্যায় আভ্যন্তরীণ জুম্ম (উপজাতীয়) উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের বিধান রয়েছে। কিন্তু যখন ভারত প্রত্যাগত ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু চিহ্নিতকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কার্যক্রম শুরু হয়, তখন শেখ হাসিনা সরকার পার্বত্য চুক্তিকে লঙ্ঘন করে সেটেলার বাঙালি মুসলমানদেরকেও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে গণ্য করে পার্বত্য চট্টগ্রামের পুনর্বাসনের জন্য চুক্তি বিরোধী প্রস্তাব উত্থাপন করে। যদিও অলিখিত চুক্তি অনুযায়ী অউপজাতীয় সেটেলারদের পার্বত্য অঞ্চলের বাইরে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসনের বিধান ছিল। এতে জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি বিরোধিতা করলেও চুক্তি লঙ্ঘন করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ থেকে ১৯ জুলাই ১৯৯৮ তারিখের এক আদেশ জারি করা হয়, যেখানে আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের সাথে সেটেলার বাঙালিদেরও পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের নির্দেশনা ছিল। জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির প্রতিবাদ ও ওয়াকআউটের মধ্যেও ১৫ মে ২০০০ অনুষ্ঠিত টাস্ক ফোর্সের একাদশ সভায় সরকার পক্ষ অবৈধ ও একতরফাভাবে ৯০,২০৮ উপজাতীয় পরিবার এবং ৩৮,১৫৬ অউপজাতীয় সেটেলার পরিবারকে আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে ঘোষণা করে। শেখ হাসিনা সরকারের চুক্তি বিরোধী এই উদ্যোগের ফলে আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া মুখ থুবড়ে পড়ে, ফলে জুম্ম উদ্বাস্তুরা এখনো দুর্গম পাহাড়ে ও রিজার্ভ ফরেস্টে শিক্ষা, চিকিৎসা, উন্নয়ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে মানবেতর জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও সরকার সেটেলার বাঙালি মুসলমানদের পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের উক্ত চুক্তি পরিপন্থী আদেশ এখনো বাতিল করেনি।

> “রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের পরিবর্তে শেখ হাসিনা সরকার পূর্বের স্বৈরশাসকদের মতো বর্তমানে কার্যত সামরিক সমাধানের পথ বেছে নিয়েছে এবং তদুদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিকায়ন জোরদার করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর চুক্তি মোতাবেক জনসংহতি সমিতি ৪৫ দিনের মধ্যে সমিতির সদস্যদের আওতাধীন সকল অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরকারের নিকট জমা দেয় এবং সমিতির সশস্ত্র শাখা বিলুপ্তির ঘোষণা দেয়। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিনের রক্তাক্ত সংঘাতের অবসান ঘটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আশি দশকে কাউন্টার ইনসার্জেন্সী কার্যক্রম হিসেবে জারিকৃত ‘অপারেশন দাবানল’ এর পরিবর্তে শেখ হাসিনা সরকার পার্বত্য চুক্তিকে লঙ্ঘন করে ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে একতরফাভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে ‘অপারেশন উত্তরণ’ নামে একপ্রকার সেনাশাসন জারি করে এবং ‘শান্তকরণ প্রকল্প’ নামে অপর

আরেকটি কাউন্টার-ইনসার্জেন্সী কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। শান্তকরণ প্রকল্পের অধীনে পূর্বের মতো সেনাবাহিনীকে ১০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ দেয়া হতে থাকে। অলিখিত চুক্তি মোতাবেক বহিরাগত সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসনের পরিবর্তে সেনাবাহিনী উক্ত বরাদ্দ সেটেলারদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যয় করতে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সিভিল প্রশাসনের সহায়তার নামে জারিকৃত 'অপারেশন উত্তরণ'-এর ক্ষমতা বলে সেনাবাহিনী কার্যত পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, ভূমি প্রশাসন, উন্নয়ন কার্যক্রম, বিচার ব্যবস্থাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল বিষয় ও কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব করতে থাকে। অথচ পার্বত্য চুক্তিতে সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের বিধান রয়েছে। কিন্তু বিগত ২৩ বছরে শেখ হাসিনা সরকার মাত্র শ খানেক অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করেছে। এখনো ৪ শতাধিক অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রামে বলবৎ রয়েছে। বর্তমানে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে প্রধান বাধা হিসেবে রয়েছে এই 'অপারেশ উত্তরণ' নামক সেনাশাসন ও চার শতাধিক অস্থায়ী ক্যাম্পের সেনা কর্তৃত্ব। এভাবে খোদ শেখ হাসিনা সরকারই প্রতি পদে পদে পার্বত্য চুক্তি লঙ্ঘন ও খর্ব করতে থাকে, যা জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণের সাথে চরম প্রতারণা ও বেঈমানীর সামিল বলে বিবেচনা করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার অন্যতম দিক হচ্ছে পার্বত্যাঞ্চলের ভূমি সমস্যা। ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত জেনারেল জিয়া ও জেনারেল এরশাদ সরকার সরকারি অর্থায়নে সমতল জেলাগুলো থেকে চার লক্ষাধিক বাঙালি মুসলিম জনগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতিপ্রদান করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে চাষযোগ্য ভূমির অভাবের কারণে সেটেলারদেরকে কার্যত জুম্ম জনগণের ভোগদখলীয় ও রেকর্ডীয় ভূমির উপর বসতি প্রদান করা হয়। যুগ যুগ ধরে বসবাসরত জুম্মদের উচ্ছেদ করে তাদের চিয়ারত জায়গা-জমি ও বসতভিটা দখল করে নেয় সেটেলাররা। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এক জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। পার্বত্য চুক্তিতে জুম্মদের বেহাত হওয়া এসব জায়গা-জমি ফেরত প্রদানের জন্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত একটি ভূমি কমিশনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান করা হয়। ভূমি কমিশনের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে সেটেলাররা যদি বেদখলকৃত জায়গা-জমি জুম্ম মালিকদের নিকট ফেরত দিতে বাধ্য হয়, তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সেটেলারদের পুনর্বাসনের কার্যক্রমেও সহায়ক হবে। এমনটাই ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অন্যতম একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

কিন্তু পার্বত্য চুক্তির অব্যবহিত পরে পৌনে চার বছর ধরে ক্ষমতায় থাকলেও শেখ হাসিনা সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন প্রণয়নে টালবাহানা করতে থাকে। অবশেষে সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রাক-মুহূর্তে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রাক্কালে তড়িঘড়ি করে ২০০১ সালের ১৭ জুলাই জনসংহতি সমিতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা না করে শেখ হাসিনা সরকার 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১' জাতীয় সংসদে পাশ করে। ফলে চুক্তিতে স্বীকৃত অধিকার ও এখতিয়ারকে খর্ব করে উক্ত আইনে কমপক্ষে ১৪টি ধারা চুক্তির সাথে বিরোধাত্মকভাবে প্রণীত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে শেখ হাসিনা সরকারের এটা ছিল সবচেয়ে বড় প্রতারনা ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে সৃষ্টি করা মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা। আইনটি যথাযথভাবে প্রণীত না হওয়ায় কার্যত পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার অন্যতম প্রধান ইস্যু 'ভূমি সমস্যা' নিরসনের কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়ে। ২০০৯ সালে পুনরায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ফিরে আসার পর শেখ হাসিনা সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর বিরোধাত্মক ধারা সংশোধন করতে আবার নানা টালবাহানা করতে থাকে। টালবাহানা করে শেখ হাসিনা সরকার ৮ বছর ধরে সময়ক্ষেপণ করে। অবশেষে ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে আইনটি সংশোধন করা হয়।

কিন্তু এরপর শেখ হাসিনা সরকার আবার ভূমি কমিশনের বিধিমালা প্রণয়নে বিগত ৪ বছর ধরে টালবাহানা করে চলেছে। ভূমি কমিশনের বিধিমালার খসড়া তৈরি করে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের তরফ থেকে ০১ জানুয়ারি ২০১৭ ভূমি মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। কিন্তু শেখ হাসিনা সরকার এখনো সেই বিধিমালা চূড়ান্ত করেনি। ভূমি কমিশনের এই বিধিমালা এখনো পর্যন্ত প্রণীত না হওয়ায় ভূমি কমিশন ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিচারিক কাজ শুরু করতে পারেনি। এভাবে পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কেবল আইন ও বিধিমালা প্রণয়নে শেখ হাসিনা সরকার বিশ বছর পার করে দিচ্ছে। বিগত ২০ বছরেও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়ার একদিকে জুম্মদের মধ্যে সরকারের উপর চরম ক্ষোভ ও হতাশা দেখা দিয়েছে, অন্যদিকে ভূমি বিরোধকে কেন্দ্র করে সরকার ও জুম্ম জনগণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি-বাঙালির মধ্যে প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখা দিতে থাকে। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এভাবে শেখ হাসিনা সরকারের প্রতিবন্ধকতার ফলে ভূমি সমস্যা সমাধান বর্তমানে কার্যত সম্পূর্ণভাবে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-বাঙালি (উপজাতীয় ও অউপজাতীয়) স্থায়ী বাসিন্দাদেরকে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভার সুপারিশের ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করা হয় তিন সার্কেল

চীফের উপর। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে উক্ত বিধান যথাযথভাবে সন্নিবেশও করা হয়। কিন্তু শেখ হাসিনা সরকার পার্বত্য চুক্তি ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনকে সম্পূর্ণভাবে লঙ্ঘন করে ২১ ডিসেম্বর ২০০০ তারিখে একটি অফিস আদেশের মাধ্যমে তিন সার্কেল চীফ ছাড়াও তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারদের স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করে। জাতীয় সংসদে প্রণীত একটি সংসদীয় আইনকে লঙ্ঘন করে এধরনের অফিস আদেশ জারি করা অবৈধ ও আইনের বরখেলাপ হলেও শেখ হাসিনা সরকার নির্লজ্জভাবে সেই কাজ সম্পন্ন করে। বার বার দাবি করা সত্ত্বেও শেখ হাসিনা সরকার এই অবৈধ ও চুক্তি বিরোধী আদেশ বাতিল করেনি। এই আদেশের ফলে ডেপুটি কমিশনাররা রোহিঙ্গাসহ বহিরাগত লোকদেরকে পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র দিয়ে চলেছেন এবং এই সনদপত্রের বদৌলতে বহিরাগতরা পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকরি, ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, ভূমি মালিকানাসহ নানাবিধ সুবিধা লাভ করে চলেছে, যা পার্বত্য চুক্তির সাথে সম্পূর্ণ বিরোধাত্মক।

প্রসঙ্গত ইহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, স্থানীয় পর্যটন অর্থাৎ পার্বত্য জেলার পর্যটন বিষয়টি ২০১৪ সালে শেখ হাসিনা সরকার তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের নিকট হস্তান্তরিত করে নামমাত্র এখতিয়ার দিয়ে। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের বা অন্য কোন সংস্থার দ্বারা পরিচালিত কোন দপ্তর ও পর্যটন কেন্দ্র পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের নিকট হস্তান্তরিত হয়নি। কেবল পার্বত্য জেলা পরিষদের নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত পর্যটন প্রকল্প ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের এখতিয়ার রাখা হয়নি, যা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে সম্পূর্ণভাবে বিরোধাত্মক। জনসংহতি সমিতি ও আঞ্চলিক পরিষদের তরফ থেকে বার বার আপত্তি করা সত্ত্বেও সরকার পর্যটন বিষয়টি যথাযথভাবে হস্তান্তরের কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। পক্ষান্তরে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও আঞ্চলিক পরিষদ আইন লঙ্ঘন করে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ও কর্তৃপক্ষ, সেনাবাহিনী ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান জুম্মদের জায়গা-জমি জবরদখল করে তিন পার্বত্য জেলায় পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করে চলেছে। যার ফলে স্থানীয় জুম্মদের জীবন জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়ছে এবং নানাভাবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমস্যা উদ্ভব হচ্ছে।

পার্বত্য সমস্যা সমাধানকল্পে তৎকালীন শেখ হাসিনা সরকারের সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠক চলাকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে পার্বত্য চুক্তির সাংবিধানিক গ্যারান্টি প্রদানের দাবি করা হয়েছিল। তখন সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছিল যে, আওয়ামীলীগ সরকারের জাতীয় সংসদে সংবিধান সংশোধনের মতো দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। তাই তাদের পক্ষে তৎসময়ে পার্বত্য চুক্তিকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা সম্ভব হবে না। তবে ভবিষ্যতে সংবিধান সংশোধনের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে সরকার সেই সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে শেখ হাসিনা সরকার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। ২০০৮ সালের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর শেখ হাসিনা সরকারের নিকট যথারীতি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে সাংবিধানিক গ্যারান্টির দাবি উত্থাপন করে জনসংহতি সমিতি। বিশেষ করে ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনগুলোর 'আইনী হেফাজত' প্রদানের জন্য সংবিধানের প্রথম তফসিলে 'কার্যকর আইন' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি করা হয়। কিন্তু শেখ হাসিনা সরকার সেই দাবির প্রতি বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেনি। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে '২৩ক' নামে 'উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়' সংক্রান্ত একটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করা হয়েছিল বটে, তবে তার দ্বারা পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক প্রণীত আইনগুলোর সাংবিধানিক রক্ষাকবচ নিশ্চিত হয়নি।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা অধিকতর জটিল আকার ধারণ করে যখন জেনারেল জিয়া ও জেনারেল এরশাদের আমলে চার লক্ষাধিক বাঙালি মুসলিমকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি প্রদান করা হয়। শেখ হাসিনা সরকারের সাথে আনুষ্ঠানিক সংলাপ চলাকালে সেটেলারদের অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার দাবি করা হলে সরকারের তরফ থেকে জনসংহতি সমিতিকে বলা হয় যে, সরকার সেটেলার বাঙালিদের অন্যত্র সরিয়ে নিতে নীতিগতভাবে সম্মত। তবে চুক্তিতে সরাসরি সেটেলারদের প্রত্যাহারের বিষয়টি লেখা হলে তা দেশে চরম প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। তাই চুক্তিতে লিপিবদ্ধ না করলেও সরকার সেটেলারদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন প্রদান করবে বলে শেখ হাসিনা সরকার সমঝোতা করে। কিন্তু সরকার অলিখিত চুক্তি অনুযায়ী সেটেলারদের সমতলে পুনর্বাসনের ব্যাপারে এযাবৎ কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। বরঞ্চ বহিরাগত সেটেলারদের অবস্থান আরও সুদৃঢ় ও সম্প্রসারণ করতে থাকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বহিরাগত বাঙালি সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসনের জন্য দুই পক্ষের মধ্যে অলিখিত চুক্তি/সমঝোতা ছিল। শেখ হাসিনা সরকার এ বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে জনসংহতি সমিতিকে বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। উল্লেখ্য যে, ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ ঢাকায় পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের পর জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদলের সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাক্ষাতের

সময়ও শেখ হাসিনা এ বিষয়ে পূর্ণ প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সেটেলার বাঙালিদের পুনর্বাসনের বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বরাদ্দকৃত অর্থ সাহায্যের কথা উঠলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, এক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থ সাহায্যের দরকার হবে না। সরকারি অর্থেই অনায়াসে বহিরাগত সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন করা সম্ভব হবে বলে তিনি দৃঢ়মত ব্যক্ত করেন। এছাড়া জুম্ম শরণার্থীদের সাথে স্বাক্ষরিত ২০-দফা প্যাকেজ চুক্তিতেও বলা হয় যে, সকল জায়গা-জমি প্রত্যর্পণ করে জুম্ম শরণার্থীদের পুনর্বাসন করা হবে। তদুদ্দেশ্যে প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের জায়গা-জমি ও গ্রাম থেকে সেটেলার বাঙালিদের অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু চুক্তির পর শেখ হাসিনা সরকার এ বিষয়ে কোন উদ্যোগই গ্রহণ করেনি। উপরন্তু এ ধরনের অলিখিত চুক্তির কথা শেখ হাসিনা সরকার বেমালুম অস্বীকার করতে থাকে, যা ছিল পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের প্রতারণা ও বেঈমানীর সামিল। ফলে প্রত্যাগত শরণার্থীদের ৪০টি গ্রাম এখনো সেটেলারদের দখলে রয়ে যায় এবং ১২ হাজারের অধিক প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী পরিবারের মধ্যে ৯ হাজারের অধিক পরিবারের ভূমি হস্তান্তর করা হয়নি।

জুম্ম শরণার্থীদের সাথে শেখ হাসিনা সরকারের স্বাক্ষরিত ২০-দফা প্যাকেজ চুক্তি মোতাবেক প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের জায়গা-জমি থেকে সেটেলার বাঙালিদের অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার পরিবর্তে শেখ হাসিনা সরকারের আমলেই ২০০০ সালে নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তায় পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় খাগড়াছড়ি জেলার সদর ও মহালছড়ি উপজেলার গামারীঢালা, বিজিতলা, নুনছড়ি, পাগুজ্যাছড়ি, কাটিং টিলা, লেমুছড়ি, জয়সেন কার্বারী পাড়া ইত্যাদি জায়গায় জুম্মদের রেকর্ডীয় ও ভোগদখলীয় জায়াগা-জমি জবরদখল করে সেটেলারদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ করা হয়েছিল। পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক পার্বত্যাঞ্চলের ভূমি সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে চুক্তি-উত্তর সময়ে শেখ হাসিনা সরকারই এভাবে ভূমি সমস্যা আরো জটিল করে তুলে। পার্বত্য চুক্তি ও ২০-দফা প্যাকেজ চুক্তি লঙ্ঘন করে সেটেলারদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ বন্ধ করার জন্য জনসংহতি সমিতির সভাপতি সন্তু লারমা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট তুলে ধরলেও তিনি কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করেননি।

শেখ হাসিনা সরকারের প্রহসন ও প্রতারণার অন্যতম নজীর হলো স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে তিন পার্বত্য জেলার ভোটার তালিকা প্রণয়নে সম্পূর্ণ বিরত থাকা। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য শেখ হাসিনা সরকার বিগত ১৬ বছরে নির্বাচন বিধিমালা ও ভোটার তালিকা বিধিমালা প্রণয়নের কোন উদ্যোগই গ্রহণ করেনি। ১৯৯৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকে পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন বিধিমালা ও ভোটার তালিকা বিধিমালার খসড়া প্রস্তুত করে শেখ হাসিনা সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছিল। জনসংহতি সমিতি ও আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকে বিধিমালা চূড়ান্তকরণের বিষয়টি বার বার তুলে ধরা হলেও চুক্তির অব্যবহিত পরে পৌণে চার বছরে শেখ হাসিনা সরকার উক্ত বিধিমালা প্রণয়নে কোন কার্যকর উদ্যোগ তো গ্রহণই করেনি, ২০০৯ সালে পুনরায় ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পরও বিগত ১২ বছরে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ফলে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের পর ২৩ বছর ধরে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। পক্ষান্তরে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত পূর্ণাঙ্গ পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠনের পরিবর্তে শেখ হাসিনা সরকার দলীয় সদস্যদের দিয়ে অন্তর্বর্তী পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠন করে চলেছে। উপরন্তু জনসংহতি সমিতি তথা পার্বত্যবাসীর বিরোধিতা সত্ত্বেও শেখ হাসিনা সরকার অন্তর্বর্তী পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য-সংখ্যা পাঁচ থেকে ১৫ জনে বৃদ্ধি করে একতরফাভাবে ২০১৪ সালে ৬ মাসের মধ্যে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করেছে। এছাড়া সব চেয়ে প্রণিধানযোগ্য যে এর ফলে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত পরিষদ গঠন ও কার্যকর করা এবং তার মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিত্বশীল পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা বর্তমানে সুদূর পরাহত হয়ে পড়েছে। এভাবেই আজ শেখ হাসিনা সরকার আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে কার্যত অচল ও অথর্ব করে রেখে দিয়েছে, যা পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বশাসিত বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনে শেখ হাসিনা সরকারের অসদিচ্ছারই প্রতিফলন ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

প্রসঙ্গত ইহাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ সংস্থা হচ্ছে আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ। এই পরিষদ সমূহে সাধারণ প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব ও ক্ষমতা ন্যস্ত রয়েছে। বলাবাহুল্য, পরিষদসমূহ সক্রিয় ও কার্যকর করতে হলে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য বিভিন্ন আইন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সংশোধন করতে হবে, অন্যথায় পরিষদসমূহ অকার্যকর অবস্থায় থেকে যাবে। তাই পার্বত্য অঞ্চলের সাধারণ প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব ও ক্ষমতা যাতে আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রয়োগ করতে না পারে সেজন্য শেখ হাসিনা সরকার ১৯০০ সালের শাসনবিধি, ১৮৬১ সালের পুলিশ এ্যাক্ট, ১৯২৭ সালের বন আইনসহ পার্বত্য অঞ্চলে প্রযোজ্য আইনসমূহ সংশোধন করতে কোন উদ্যোগ নেয়নি। বরঞ্চ তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপারকে সরকার সুরক্ষিত রেখে তাদের মাধ্যমে জেলার সাধারণ প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা

সেনা কর্তৃত্বের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে অপপ্রয়োগ করে চলেছে, যা পার্বত্য চুক্তির সাথে বিরোধাত্মক।

পার্বত্য চুক্তির প্রতি শেখ হাসিনা সরকারের আরেক বড় চুক্তি-পরিপন্থী কার্যক্রম হলো চুক্তি লঙ্ঘন করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ১১ নির্দেশনা জারি করা। ২০১৫ সালের ৭ জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে কোন দেশী-বিদেশী ব্যক্তি/সংস্থা কর্তৃক পার্বত্য অঞ্চলে আদিবাসী জুম্মদের (সরকারি ভাষায় উপজাতীয়দের) সাথে সাক্ষাতের সময় স্থানীয় প্রশাসন এবং সেনাবাহিনী/বিজিবি'র উপস্থিতি নিশ্চিত করা, পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণে ইচ্ছুক বিদেশী নাগরিকদের ভ্রমণের একমাস আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নেয়া, তিন পার্বত্য জেলায় কর্মরত জুম্ম পুলিশ সদস্যদের অন্য জেলায় বদলি করাসহ ১১টি নির্দেশনা জারি করে। অথচ পার্বত্য চুক্তিতে 'পুলিশ (স্থানীয়)' বিষয়টি তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা এবং পরিষদ কর্তৃক কনষ্টেবল থেকে সাব-ইন্সপেক্টর নিয়োগ দিয়ে পার্বত্য পুলিশ বাহিনী গঠনের বিধান রয়েছে। কিন্তু পুলিশ বিষয়টি হস্তান্তর এবং কনস্টেবল থেকে সাব-ইন্সপেক্টর পদে জুম্মদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ তো দূরের কথা, বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে কর্মরত জুম্ম পুলিশ সদস্যদের মধ্যে যাদেরকে তিন পার্বত্য জেলায় পোস্টিং দেয়া হয়েছিল, তাদেরকেও অন্য জেলায় বদলি করার চুক্তি বিরোধী নির্দেশ দেয় শেখ হাসিনা সরকার। আর সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের প্রতিনিধির উপস্থিতি ছাড়া কোন কূটনৈতিক ও বিদেশী ব্যক্তি, সার্কেল চীফ ও জনপ্রতিনিধিসহ জুম্মদের সাথে দেখা-সাক্ষাতে বিধিনিষেধ আরোপের মূল উদ্দেশ্যই হলো জুম্ম জনগণকে বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করা, যা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মূল চেতনার সম্পূর্ণ বিরোধী। এটা শেখ হাসিনা সরকারের দেশবাসী ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অন্ধকারে রেখে জুম্ম জনগণের উপর নির্বিচারে দমন-পীড়ন চালানোর অপচেষ্টা বৈ কিছু নয়। এভাবেই শেখ হাসিনা সরকার একের পর এক চুক্তি বিরোধী কার্যক্রম হাতে নিয়ে জুম্ম জনগণের সাথে চরম প্রতারণা করে থাকে।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার ১৬ বছর মেয়াদকালে শেখ হাসিনার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে সন্তু লারমার বহু বার বৈঠক ও সাক্ষাৎ হয়েছে। সর্বোচ্চ পর্যায়ে এসব বৈঠকে চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু এসব সিদ্ধান্তবলী কখনোই বাস্তবমুখ দেখেনি। সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে জনসংহতি সমিতির সভাপতি সন্তু লারমা চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়গুলো পরিচিহ্নিত করে সহায়ক দলিলের ১৬টি পরিশিষ্ট সংযুক্ত করে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যেসব বিষয় বাস্তবায়িত হয়নি তার বিবরণ' শীর্ষক ১৮ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন ১ এপ্রিল ২০১৫ প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করেছিলেন। কিন্তু এসব অবাস্তবায়িত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কাজের কাজ কোন কিছুই অগ্রগতি হয়নি। এমনিতর অবস্থায় শেখ হাসিনা সরকার কর্তৃক জুম্ম জনগণকে প্রতারণা করা হয়েছে বলে জনসংহতি সমিতির অভিযোগ কখনোই অযৌক্তিক হতে পারে না।

বস্তুত দেশে-বিদেশে প্রবল চাপে পড়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের ঘোষণা দিয়ে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভূমি অধিকার স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিল বটে, কিন্তু কার্যত মনেপ্রাণে তা তিনি গ্রহণ করেননি। ফলে শেখ হাসিনা ও তার সরকারের উগ্র জাতীয়তাবাদী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক খোলস উন্মোচিত হতে বেশি দিন লাগেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের যে মূল উদ্দেশ্য নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, সেই রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানে শেখ হাসিনা সরকার তো এগিয়েই আসেননি, উপরন্তু সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনী দিয়ে দমন-পীড়ন চালিয়ে পূর্বের স্বৈরশাসকদের মতো শেখ হাসিনা সরকার ও তাঁর দল পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে সোচ্চার জুম্ম জনগণের কণ্ঠকে চিরতরে রোধ করার নীতি গ্রহণ করে। শুধু তাই নয়, শেখ হাসিনা সরকার পূর্বের স্বৈরশাসকদের মতো জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও সংস্কৃতি বিধ্বংসী তথাকথিত উন্নয়ন কার্যক্রম (ডেভেলাপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং) গ্রহণের মাধ্যমে একদিকে জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করতে থাকে, অন্যদিকে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার পাকিস্তানী শাসকদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার নীলনকশা বাস্তবায়ন করে চলেছে। তদুদ্দেশ্যে অপারেশন উত্তরণ নামক সেনা শাসন বলবৎ রাখা, জনসংহতি সমিতির অস্তিত্ব ধ্বংস করা; জুম্মদের দুই লক্ষাধিক একর ভোগদলীয় জুমভূমি ও মৌজাভূমিকে একতরফাভাবে রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণা, বহিরাগতদের নিকট হাজার হাজার একর ভূমি ইজারা প্রদান, সেনা ছাউনি স্থাপন ও সম্প্রসারণের নামে হাজার হাজার একর ভূমি অধিগ্রহণ, সেনাবাহিনীর পর্যটন শিল্পের জন্য শত শত একর পাহাড় বেদখল, সেটেলারদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ ও বহিরাগতদের অব্যাহত বসতিপ্রদান, জুম্ম জনগণের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা ও গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া, জুম্ম নারী ও শিশুদের উপর সহিংসতা ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে শেখ হাসিনা সরকার জুম্ম জনগণকে তাদের চিরায়ত ভূমি ও বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করে চলেছে।

রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের পরিবর্তে শেখ হাসিনা সরকার পূর্বের স্বৈরশাসকদের মতো বর্তমানে কার্যত সামরিক

সমাধানের পথ বেছে নিয়েছে এবং তদুদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিকায়ন জোরদার করেছে। তারই অংশ হিসেবে সম্প্রতি শেখ হাসিনা সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় নতুন নতুন ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। জনসংহতি সমিতিসহ পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে সোচ্চার ব্যক্তি ও সংগঠনকে 'সন্ত্রাসী', 'চাঁদাবাজ', অস্ত্রধারী দুর্বৃত্ত' হিসেবে পরিচিহ্নিত করার জন্য শেখ হাসিনা সরকার ব্যাপক অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম জোরদার করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে সেনা অভিযান, ঘরবাড়ি তল্লাসী, গ্রেফতার, ক্রশফায়ারের নামে বিচার-বহির্ভুত হত্যা, ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের ইত্যাদি জোরদার করা হয়েছে। একদিকে ভাড়াটে হলুদ সাংবাদিকদের মাধ্যমে জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণ সম্পর্কে অপপ্রচার করা, অন্যদিকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সভা-সমিতির স্বাধীনতা, মানবাধিকার লঙ্ঘনের সংবাদ প্রকাশের বিধি-নিষেধ আরোপের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামকে কার্যত অবরুদ্ধ অঞ্চলে পরিণত করা হয়েছে। ফলে সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতনের খবর সম্পূর্ণভাবে দেশের সংবাদ মাধ্যমের অন্তরালে থেকে যাচ্ছে। এভাবেই আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি চুক্তি-পূর্ব পরিস্থিতির মতো অস্থিতিশীল ও সংঘাতময় হয়ে উঠছে।

শেখ হাসিনা সরকার কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামের ইস্যুতে বেঈমানী করেছে তাই নয়, দেশের সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জাতিসমূহের সাথেও চরম প্রতারনা করেছে। শেখ হাসিনা সরকার সমতল অঞ্চলের আদিবাসী জাতিসমূহের ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য ভূমি কমিশন গঠনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিল। কিন্তু বিগত ১২ বছরে তার ধারেকাছেও ঘেঁষেনি শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার। অপরদিকে অর্পিত সম্পত্তির নামে আদিবাসীসহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া জায়গা-জমি ফেরতদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেও বিগত একযুগ ধরে কেবল আইনটির সংশোধনে সময় ক্ষেপণ করেছে। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে কাজের কাজ কোন কিছুই অগ্রগতি লাভ করেনি। সম্প্রতি গত এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদ অভিযোগ করেছে যে, বিশ্বব্যাপী প্রাণঘাতি করোনা মহামারীর দুর্যোগেও হিন্দুদের উপর হামলা, ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও ভূমি বেদখল বন্ধ হয়নি। শেখ হাসিনা সরকারের আমলেও হামলাকারীদের দায়মুক্তির ব্যাঘাত ঘটেনি বলেই করোনা সংকটেও ধারাবাহিক হামলা অব্যাহত রয়েছে। অথচ সংখ্যালঘু হিন্দুদের পরাকাষ্ঠা সেজে মধুমাখা অমৃত বাণী ঝরাতে শেখ হাসিনার সত্যিই জুড়ি মেলা ভার।

শেখ হাসিনা নিজেকে ও তার সরকারকে অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক হিসেবে দাবি করলেও তার সরকারকে দেখা গেছে সৌদি আরবের মতো মৌলবাদী ইসলামী সামরিক জোটের সাথে জোটবদ্ধ হতে, হেফাজতে ইসলামীর মতো জঙ্গীবাদী ইসলামী সংগঠনের সাথে আঁতাত করতে, হেফাজতে ইসলামীর মদদে পাঠ্য-পুস্তক থেকে অমুসলিম লেখকদের লেখা বাদ দেয়ার ও ইসলামী ধারার পাঠ্যক্রম চালু করার উদ্যোগ নিতে। দক্ষিণপন্থী ও মৌলবাদী রাজনৈতিক দল ও সংগঠনসমূহের চরিত্র সহজে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু শেখ হাসিনার মতো শাসককূলের উগ্র জাতীয়তাবাদী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক কদর্য ও প্রবঞ্চক চরিত্র সহজে চিহ্নিত করা যায় না। কারণ তারা জনগণকে বিভ্রান্ত করতে ছলনা ও ভন্ডামীর আশ্রয় নেয়। তাদের বর্ণচোরা ভূমিকার কারণে মানুষ সহজেই বিভ্রান্ত হয় এবং ভন্ডামীর ফাঁদে পড়ে মানুষ সহজে প্রতারণার শিকার হয়। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুতে, আদিবাসী ইস্যুতে, সংখ্যালঘু ইস্যুতে দক্ষিণপন্থী ও মৌলবাদী রাজনৈতিক দলসমূহ থেকে শেখ হাসিনা সরকার ও তাঁর দলের নীতির কোন তফাৎ নেই, বরঞ্চ আরো বেশি ভয়ঙ্কর ও ধ্বংসাত্মক।

ক্ষমতাসীন দল ও সরকারি ব্যক্তিবর্গ শেখ হাসিনার রাজনৈতিক সফলতার অন্যতম উদাহরণ হিসেবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রায়ই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনকেই উল্লেখ করে থাকেন। পার্বত্য সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের উদ্যোগের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৯৯৮ সালে ইউনেস্কোর হুপে-বোয়ানি শান্তি পুরস্কার এবং ২০০৯ সালে ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কার প্রাপ্তির কথা বড়াই করে ক্ষমতাসীন দলের লোকেরা বলে থাকেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতি প্রদান করে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করা যেমন কোন জননেত্রী বা জনদরদী রাজনীতিকের চরিত্র হতে পারে না, তেমনি তা সাফল্য হিসেবে বড়াই করারও কোন বাস্তবতা আছে বলে গণ্য করা যায় না। বরঞ্চ এটাকে চরম প্রতারণা, বেঈমানী ও ভন্ডামীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে ইতিহাসের উপজীব্য বলে বলা যেতে পারে। আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার ঢালি মেলে ধরে, রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের লোভনীয় প্রতিশ্রুতি দিয়ে শেখ হাসিনা সরকার ও তাঁর দল যে পার্বত্য চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, বস্তুত তা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের জন্য নয়, তার পেছনে মূল উদ্দেশ্যই হলো প্রতারণার ফাঁদ পেতে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা শান্তিবাহিনীর অস্ত্র ও গোলাবারুদ কেড়ে নিয়ে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা এবং জনসংহতি সমিতির কার্যক্ষমতাকে ধ্বংস করে দেয়া। বলা বাহুল্য তার মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকার হয়তো সাময়িক সাফল্য অর্জন করতে পারে কিন্তু ইতিহাসে ইহা রাজনৈতিক প্রতারণা, প্রহসন ও ভন্ডামি হিসেবে অমোচনীয় হয়ে থাকবে। পক্ষান্তরে অধিকারকামী জুম্ম জনগণকে একটা মরণপণ আন্দোলনে ঠেলে দেওয়া হলো বলে বলা যেতে পারে, যা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে কখনোই কাম্য হতে পারে না।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বহুমাত্রিক সমস্যার ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পটভূমি

শাহরিয়ার কবীর

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ১৪টি সংখ্যালঘু জাতিসত্তার উপর ধারাবাহিক, হত্যা, নির্যাতন, শোষণ, উৎখাত ও বঞ্চনাজনিত মানবাধিকার লংঘনের সমস্যা বহুমাত্রিক। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও এই সমস্যার রয়েছে ঐতিহাসিক, প্রশাসনিক, সামরিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, কূটনৈতিক ও মনস্তাত্বিক দিক এবং এর একটি অপরটির সঙ্গে এমনই নিবিড়ভাবে যুক্ত যে কোনটিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা সম্ভব নয়। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে এই সমস্যা সৃষ্টি করেছে রাষ্ট্র, সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র, মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীসমূহ, বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা এবং সুবিধাপ্রাপ্ত অভিবাসী বাঙালি সম্প্রদায়।

১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যখন পাকিস্তান নামক ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে তখন থেকে 'অভ্যন্তরীণ উপনিবেশিককরণ' নীতি অনুযায়ী আদিবাসীদের জমি কেড়ে নেয়া, সামরিক-আধাসামরিক বা অসামরিক ব্যক্তিদের দ্বারা নির্যাতন, হত্যা এবং শিক্ষা-স্বাস্থ্য-আবাসন-ব্যবসা-চাকরিতে বঞ্চনা, অবকাঠামো উন্নয়নে বৈষম্য, ধর্মপালন ও সংস্কৃতি চর্চায় বিঘ্ন সৃষ্টি প্রভৃতি প্রাত্যহিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

“ রাষ্ট্রের এই নির্যাতন, বঞ্চনা ও আগ্রাসন বাংলাদেশের পাহাড় ও সমতলের আদিবাসীদের অস্তিত্ব ক্রমশ বিপন্ন করে তুলছে।

বাংলাদেশের '৭২এর সংবিধানকে গণ্য করা হয় বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান হিসেবে। শতকরা ৯০ ভাগ জনসংখ্যা মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের অন্যতম নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে যা সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের জন্য স্বস্তিদায়ক হলেও এই সংবিধানে আদিবাসীর স্বতন্ত্র জাতিসত্তার কোনও স্বীকৃতি এবং বিশেষ মর্যাদার কোন বিষয় উল্লেখ করা হয়নি। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, দুই উর্দিপরা জেনারেলের জমানায় ৫ম ও ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে '৭২-এর সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা মুছে ফেলে উপরে 'বিসমিল্লাহ' এবং মুখবন্ধে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস' স্থাপন করে এটিকে একটি সাম্প্রদায়িক সংবিধানে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ৮ম সংশোধনী জারি করে যখন ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে সংবিধানে ঢোকানো হয় তখন থেকে সংখ্যালঘু অমুসলিম ধর্মীয় ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের সদস্যরা কার্যত দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হয়েছে।

রাষ্ট্রের এই নির্যাতন, বঞ্চনা ও আগ্রাসন বাংলাদেশের পাহাড় ও সমতলের আদিবাসীদের অস্তিত্ব ক্রমশ বিপন্ন করে তুলছে। ১৯৭১-এর আদমশুমারি থেকে আমরা জানতে পারি বাংলাদেশে ৪৫টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অবস্থান রয়েছে পাহাড় ও সমতলে, যাদের ভাষার সংখ্যা ৩২। গত আটত্রিশ বছরে বাংলাদেশে অন্ততপক্ষে দশটি নৃ-গোষ্ঠী হারিয়ে গেছে, বিলুপ্ত হয়েছে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, জ্ঞান ও ইতিহাস। আদিবাসীদের প্রতি রাষ্ট্রের বৈরি মনোভাব পরিবর্তিত না হলে একশ বছর পর বাংলাদেশে আদিবাসী পরিচয়ের কারও অস্তিত্ব থাকবে না।

এই গাঙ্গেয় অববাহিকায় সভ্যতা নির্মাণে আদিবাসীদের অবদান কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাহাড় ও সমতলের আদিবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এমনকি ব্রিটিশ ভারতে স্বাধীনতার সংগ্রামেও আদিবাসীদের অবদান কম নয়। অথচ রাষ্ট্র যখন আদিবাসীদের অধিকার ও মর্যাদা কেড়ে নেয় সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি কোনও প্রতিবাদ করে না। যে বাঙালি পাকিস্তানের কলোনিসুলভ শাসন-পীড়ন-বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছে, সেই বাঙালি স্বদেশী আদিবাসীদের প্রতি পাঞ্জাবিদের মতো ঔপনিবেশিক প্রভুসুলভ আচরণ করছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ধারণা ছিল তাদের এলাকা ভারত বা বার্মার অন্তর্ভুক্ত হবে। যে কারণে ১৪ আগস্ট পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র পাকিস্তানি পতাকা উত্তোলিত হলেও ১৫ আগস্ট রাঙ্গামাটিতে ভারতীয় পতাকা এবং বান্দরবানে বার্মার পতাকা উত্তোলিত হয়। ১৭ আগস্ট র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ প্রকাশিত হলে জানা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের ভাগে পড়েছে। ২১ আগস্ট পাকিস্তানি সৈন্যরা রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানে গিয়ে ভারতীয় ও বার্মার পতাকা নামিয়ে পাকিস্তানি পতাকা উত্তোলন করে।

এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য পাকিস্তানি শাসকরা পার্বত্য চট্টগ্রামে জমির প্রলোভন দেখিয়ে সমতলের বাঙালিদের বসতি স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু করে। ১৯৪৭ সালে যে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জনসংখ্যা ছিল শতকরা ৯৭ ভাগ, '৬১ সালে তা কমে ৮৫ ভাগে দাঁড়ায়। ১৯৯৭-এ শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জনসংখ্যা ছিল শতকরা ৫২ ভাগ।

পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করতে গিয়ে এক লক্ষ আদিবাসীকে স্থানচ্যুত করা হয়েছে ক্ষতিপূরণ অথবা বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা না করেই। উপত্যকার ৪০ শতাংশ কৃষিজমি পানির নিচে তলিয়ে গিয়েছে। কাপ্তাই হ্রদের নিচে হারিয়ে গিয়েছে চাকমা রাজার প্রাসাদ। উৎখাত হওয়া চাকমাদের অনেকে আশ্রয় নিয়েছিল ভারতের অরুণাচলে, চার দশকেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তারা সে দেশের নাগরিকত্ব লাভ করেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা বঞ্চনা ও নির্যাতন বন্ধের সকল নিয়মতান্ত্রিক উপায় বন্ধ হয়ে গেলে তারা অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে।

এই সশস্ত্র সংগ্রাম দমনের নামে সেনাবাহিনী এবং বহিরাগত বাঙালিরা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপর গণহত্যাসহ যে ধরনের নির্যাতন চালিয়েছে, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত করেছে। ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের সংক্ষুব্ধ আদিবাসীদের সঙ্গে শেখ হাসিনার সরকার শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করার পর সংগ্রামের অবসান হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের হৃত ভাবমূর্তি বহুলাংশে উজ্জ্বল হয়েছে।

শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের আগে ও পরে বিএনপি-জামাতের মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক জোট যেভাবে এর বিরোধিতা করেছে তাতে এই অশুভ শক্তির দেশ ও জাতিবিরোধী অবস্থান আরও প্রকট হয়েছে। এ বিষয়ে তখন আমার একটি বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলাম, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিচুক্তি দেশে ও বিদেশে শান্তিকামী ও গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষের দ্বারা বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞ ও পর্যবেক্ষকদের অনেকে এই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, বিশ্বের যে সমস্ত দেশে এ ধরনের এথনিক সমস্যা রয়েছে যা বহু বর্ষব্যাপী সংঘর্ষ ও রক্তপাতের ভেতর আজও অব্যাহত রয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তি সে সব দেশের জন্য অনুকরণযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

'পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা যেমন প্রাচীন তেমনই জটিল। অত্যন্ত প্রতিকূল এক পরিস্থিতি অনুকূলে এনে শেখ হাসিনার সরকারকে এ চুক্তি করতে হয়েছে পার্বত্য জেলাসমূহে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য, মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্য।

'শেখ হাসিনার সরকারের পক্ষে এই চুক্তি স্বাক্ষর করা সম্ভব হয়েছে কারণ, তিন পার্বত্য জেলার নির্বাচিত সাংসদরা হচ্ছেন এই দলের প্রতিনিধি। আওয়ামী লীগ একমাত্র দল যাদের অবস্থান রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি ও বাঙালি উভয় সম্প্রদায়ের ভেতর। বিএনপি, জামাত ও অপরাপর সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী দলগুলো যারা শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করছে তাদের এই এলাকায় উল্লেখযোগ্য জনসমর্থন নেই। বহিরাগত বাঙালিদের ভেতর কিছু সমর্থন থাকলেও বিপুল সংখ্যক বাঙালি ও পাহাড়ি সম্প্রদায় বিএনপিকে সমর্থন করে না। কারণ তারা জানে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিএনপি ও তাদের সহযোগীরা সরাসরি অবস্থান নিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। বিএনপি, জামাত ও তাদের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সহযোগীরা বাংলাদেশে কোনও অমুসলমান রাখতে চায় না।

'শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগে থেকেই প্রধান বিরোধী দল বিএনপি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের বিরোধী জামাতে ইসলামী এবং তাদের অপরাপর সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী দলগুলোকে সঙ্গে নিয়ে এর বিরোধিতা করছে। তাদের এই বিরোধিতা এবং বিরোধিতা করতে গিয়ে নানাবিধ ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ এক সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক চক্রান্তের অন্তর্গত। বিএনপি ও তার সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী সহযোগীরা শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করতে গিয়ে সর্বশেষ অবস্থান থেকে জেহাদের ডাক দিয়েছে। জামাতপন্থী বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. হাসানউজ্জামান চৌধুরী 'পার্বত্য শান্তি চুক্তি একটি আগাগোড়া প্রামাণ্য বিশ্লেষণ' নামে একটি বই লিখেছেন। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি এ বইয়ের প্রকাশনা উৎসবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি, জামাত ও অপরাপর উগ্র সাম্প্রদায়িক দলসমূহের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ। ১৭ ফেব্রুয়ারি '৯৮ দৈনিক জনকণ্ঠের প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে যে, এই আলোচনা সভায় জামাতী লেখক হাসানুজ্জামান চৌধুরী বলেছেন, 'যে কারণে আমরা নামাজ পড়ি সে কারণেই শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করতে হবে। ইসলাম এবং পার্বত্য শান্তিচুক্তি এখন মুখোমুখি।'

'এই আলোচনা সভায় শায়খুল হাদিস মওলানা আজিজুল হক বলেছেন, 'চুক্তি হয়ে গেছে বলে কান্নাকাটি করে লাভ হবে না। জেহাদে যেতে হবে। পার্বত্য চুক্তির ইস্যুতে নবী করিম (সা:)-এর সময়কার মতো যুদ্ধের সময় চলে এসেছে।' '৯২ সালে ভারতে বাবরী মসজিদ ভাঙার পর এই মওলানাই বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হামলা প্ররোচিত করার জন্য বলেছিলেন 'ইসলাম নামক বৃক্ষটির গোড়ায় পানি নয়, রক্ত

ঢালতে হবে।' এর ফলশ্রুতি হিসেবে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর তখন নজিরবিহীন নৃশংস হামলা চালানো হয়েছিল।

'আলোচনা সভায় একাত্তরে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর প্রধান সহযোগী জামাত নেতা যুদ্ধাপরাধী আব্বাস আলী খান বলেছেন, 'পার্বত্য চুক্তি কার্যকর হলে দেশের মানুষের ওপর লানত হবে।' অপর যুদ্ধাপরাধী জামাত নেতা মওলানা দেলোয়ার হোসেন সাইদী বলেছেন, 'আমাদের সামনে এর চেয়ে বড় ইস্যু কবে আসবে! আসুন জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ি। জেহাদের সময় এসেছে। আমরা জেহাদে নেমে গেলাম।' এই সভায় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সহযোগী বিএনপি নেতা আনোয়ার জাহিদ, জামাত নেতা কামরুজ্জামান, আবদুল কাদের মোল্লা প্রমূখ একই ধরনের বক্তব্য রেখেছেন।

'৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে যেভাবে জামাত ও তাদের সহযোগীরা ইসলামের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল, শান্তি চুক্তিকে তারা একইভাবে 'ইসলামের মুখোমুখি' দাঁড় করাতে চায়। ইসলামের দোহাই দিয়েই '৭১-এ তারা ৩০ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা এবং ২ লক্ষ ৬৯ হাজার নারীকে ধর্ষণ করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে সম্পর্কিত যে কোনও কার্যক্রম তাদের ভাষায় ইসলামের শত্রু এবং ভারতের চক্রান্ত।

'প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে তারা শান্তি আলোচনার শুরু থেকেই জেহাদের হুঙ্কার দিচ্ছিল। তদের সকল হুঙ্কার ও প্রতিবন্ধকতা অগ্রাহ্য করে শান্তি চুক্তি হয়েছে এবং এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াও আরম্ভ হয়েছে। হরতাল ডেকে তারা অস্ত্র জমাদান অনুষ্ঠান বানচাল করতে পারেনি। ১০ ফেব্রুয়ারি (১৯৯৮) প্রচণ্ড উৎসাহ আর আগ্রহ নিয়ে তিন পার্বত্য জেলার বিপুল সংখ্যক পাহাড়ি বাঙালি সমবেত হয়েছিল খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে। বহু রাষ্ট্রদূত, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি ও বিদেশী সাংবাদিক এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, যারা এক বাক্যে শান্তির এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন।

'পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ বাঙালিরাও বুঝে গেছে বিএনপি ও জামাত তাদের যেসব কথা বলে উত্তেজিত করতে চাইছে বাস্তবে তার কোনও ভিত্তি নেই। সচেতন বাঙালি মাত্রেই জানে সংবিধান থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ খারিজ করে কিভাবে জিয়ার আমল থেকে বিএনপি বাঙালির যাবতীয় অর্জনকে ধ্বংস করতে চাইছে। '৭১-এ যারা বাঙালিদের কাফের আখ্যা দিয়ে হত্যা করেছিল, যারা বাঙালি নারীদের 'গণিমতের মাল' বলে পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে তুলে দিয়েছিল, সেই জামাতীদের বাঙালিপ্রেমও পার্বত্য এলাকায় শিক্ষিত বাঙালি সমাজের অজানা নয়।

'পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি ও বাঙালি মাত্রেই এ বিষয়ে সম্যকরূপে অবগতযুদ্ধাবস্থা জারি থাকলে জীবন কীভাবে দুর্বিষহ হয়, কীভাবে আতঙ্কের ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হয় প্রতিটি প্রহর, কীভাবে সইতে হয় আপনজন হারানোর তীব্র বেদনা। ২০ হাজার পাহাড়ি বাঙালির জীবনের বিনিময়ে এই উপলব্ধি আজ শান্তিকামী প্রতিটি মানুষের ভেতর এসেছে যে, শক্তি প্রয়োগ করে এ ধরনের সমস্যার সমাধান হয় না। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জাতিসত্তা সংখ্যায় যত ক্ষুদ্র হোক না কেন তাদের নিশ্চিহ্ন করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

বরং গত ১৫ বছর ধরে আমরা দেখেছি তাদের পক্ষে বিশ্বজনমত যেভাবে সংগঠিত হয়েছে, যেভাবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা তাদের পক্ষ নিয়েছে, বাংলাদেশের মতো বিদেশী সাহায্য নির্ভর দরিদ্র দেশের পক্ষে তার মোকাবেলা করা অসম্ভব। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পেরেছিল বলেই জেনারেল এরশাদের সরকারকে শুরু করতে হয়েছিল শান্তি আলোচনা, প্রণয়ন করতে হয়েছে 'পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন' এবং খালেদা জিয়ার সরকারকেও সেই প্রক্রিয়া জারি রাখতে হয়েছিল।

'গত দু দশক পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি সম্প্রদায়ের উপর সরকারের নির্মম নির্যাতন, হত্যা, নারী নির্যাতন, গৃহে অগ্নিসংযোগ প্রভৃতির কারণে বাংলাদেশে প্রচণ্ডভাবে নিন্দিত হয়েছিল বহির্বিশ্বে। জাতিসংঘ ও ইউরোপীয় পার্লামেন্টসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামে চরম মানবাধিকার লংঘনের জন্য বাংলাদেশের সমালোচনা হয়েছে। দাতা দেশসমূহকে বলা হয়েছে সাহায্য বন্ধ করে দেয়ার জন্য। পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলিতে বাংলাদেশের হৃত মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে।' (শান্তির পথে অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম: শাহরিয়ার কবির, অনুপম প্রকাশনী, বইমেলা ১৯৯৮, পৃ. ৭-৯)।

পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের আগে বিএনপি প্রধান খালেদা জিয়া বলেছিলেন, এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের অংশ হয়ে যাবে। অথচ '৯১ থেকে '৯৬ পর্যন্ত প্রথমবার তিনি যখন ক্ষমতায় ছিলেন আন্তর্জাতিক চাপের কারণে তাঁকেও সংক্ষুব্ধ পাহাড়ীদের সঙ্গে আলোচনা করতে হয়েছিল এবং সেনা প্রত্যাহারের দাবি মেনে নিতে হয়েছিল। পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর দুই দশকের অধিক পেরিয়ে গেছে, খালেদা জিয়ার মুখে ছাই দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম এখনও বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে রয়ে গেছে।

পৃথিবীর যে সকল দেশে বাংলাদেশের মতো এথনিক সমস্যা রয়েছে সর্বত্র সংবিধানে তাদের জন্য সংরক্ষিত এলাকার বিধান রয়েছে এবং এটি জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃত বিধান। বেশি দূরে যাওয়ার দরকার নেই, পাকিস্তানে উপজাতি অধ্যুষিত কোরাম, খাইবার,

মালাকান্দ এবং ভারতের জম্মু, কাশ্মীর, অরুণাচল, মিজোরাম প্রভৃতি অঞ্চলে এ ধরনের বিধান রয়েছে যার দ্বারা এসব অঞ্চলের অধিবাসীদের জাতীয় অস্তিত্ব, ভূমিসত্ব এবং মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বঞ্চিত ও অবহেলিত পাহাড়ি সম্প্রদায়ের জন্য আংশিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা আমাদের সংবিধানের কাঠামোর ভেতরই করা হয়েছে। সংরক্ষণের অর্থ এটা নয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশের নাগরিকরা যাওয়া আসা করতে পারবেন না। বাংলাদেশের যে কোন অঞ্চলের যে কোনও নাগরিক বৈধ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যবসা-বাণিজ্যও করতে পারবেন। সংরক্ষণ ব্যবস্থা শুধুমাত্র জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রেই রাখা হয়েছে। জেনারেল এরশাদের আমলে প্রণীত 'রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯'-এও পাহাড়িদের এ অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছিল। এই আইনের ৬৪ ধারায় বলা হয়েছে, 'আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাংগামাটি পার্বত্য জেলার এলাকাধীন কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে না, এবং অনুরূপ অনুমোদন ব্যতিরেকে উক্তরূপ কোন জায়গা-জমি উক্ত জেলার বাসিন্দা নহেন এইরূপ কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা যাইবে না।'

বিএনপি যখন জনসংহতির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করেছে তখন তারাও এই ধারাটি সমর্থন করে বলেছে এটি পাহাড়িদের রক্ষাকবচ হিসেবে করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করার ধারাবাহিকতায় এতদঞ্চলে মুসলিম বাঙালি অভিবাসনের কারণে জঙ্গী মৌলবাদের ঘাঁটি স্থাপন ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। ১৯৭৯ সালে জিয়াউর রহমানের জমানায় বার্মা থেকে ব্যাপক হারে রোহিঙ্গা মুসলিমদের আগমন ঘটেছে এই অঞ্চলে। রোহিঙ্গাদের সাহায্যের নামে কিছু মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক দল গত ৩০ বছরে মধ্যপ্রাচ্য ও ওআইসির অর্থে পার্বত্য চট্টগ্রামে শত শত মাদ্রাসা বানিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ইসলামিকরণ ও পাকিস্তানিকরণে জিয়াউর রহমানকে মদদ দিয়েছে জামাতে ইসলামী ও তাদের আন্তর্জাতিক মুরুব্বি সৌদি আরব ও পাকিস্তান। ১৯৬১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে মসজিদ ছিল ৪০টি, মাদ্রাসা ছিল ২টি। জিয়ার আমলে ১৯৮১ সালে মসজিদের সংখ্যা হয়েছে ৫৯২টি এবং মাদ্রাসা ৩৫টি। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে মসজিদের সংখ্যা ৩,০০০ এবং সরকারি-বেসরকারি মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় ৮০০।

এই সব মাদ্রাসা কেন্দ্র করে পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর প্রত্যক্ষ মদদে জঙ্গী-রিক্রুট, তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বহিরাগত জঙ্গীদের আশ্রয়স্থল গড়ে উঠেছে। তিন পার্বত্য জেলা, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে বাংলাদেশী ও রোহিঙ্গাদের দুই ডজন জঙ্গী মৌলবাদী সংগঠন রয়েছে। বিএনপি ও জামাতে ইসলামী বাঙালি জাতীয়তাবাদকে ইসলামবিরোধী বা হিন্দুয়ানি বিবেচনা করলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে তারা বাংলাদেশী নয়, ঘোরতর বাঙালি! মূলতঃ জামাতের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম জঙ্গী মৌলবাদীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। এই জঙ্গীরা শুধু অমুসলিম আদিবাসী নয়, বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার জন্যও বড় ধরনের হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো আদিবাসীদের অস্তিত্ব ও মানবাধিকার রক্ষার জন্য অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে এখন বেশি উদ্বিগ্ন। বাংলাদেশ জাতিসংঘের 'সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ' ছাড়াও বারোটি আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও প্রটোকলে স্বাক্ষর করেছে, যেখানে আদিবাসীদের মানবাধিকারের কথা বলা হয়েছে। সভ্যতার মানচিত্রে স্থান পেতে হলে বাংলাদেশকে অবশ্যই আদিবাসীদের বিশেষ অধিকার ও মর্যাদার সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানের পাশাপাশি তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা ও বিকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশে স্বতন্ত্র ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ আদিবাসীদের মর্যাদাব্যঞ্জক অবস্থান আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে, যা অতীতে বার বার কলঙ্কিত হয়েছে।

> ক্ষমা গুণ, শিক্ষা গ্রহণের গুণ ও পরিবর্তিত হওয়ার গুণ– এই তিন গুণের অধিকারী না হলে প্রকৃত বিপ্লবী হওয়া যায় না।
>
> *– মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*

জনসংহতি সমিতির মুখপাত্র ড. রামেন্দু শেখর দেওয়ান

মঙ্গল কুমার চাকমা

ড. রামেন্দু শেখর দেওয়ান যিনি ড. আর এস দেওয়ান নামে সমধিক পরিচিত, তিনি একজন নিখাদ দেশপ্রেমিক ও আজীবন সংগ্রামী মানুষ। তিনি জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের পক্ষে আন্তর্জাতিক প্রচারকার্যের অন্যতম পুরোধা। যুক্তরাজ্য ও ইউরোপে তাঁর মাধ্যমে জুম্ম জনগণের অধিকারের পক্ষে আন্তর্জাতিক প্রচারাভিযানের পত্তন ঘটেছে যা ধীরে ধীরে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যক্তি জীবনে তিনি অত্যন্ত সৎ, নিষ্ঠাবান ও সাদাসিধা জীবনযাপনে অভ্যস্ত। দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে সুদূর যুক্তরাজ্যে থেকেও নিজের দেশ ও স্বজাতির প্রতি তাঁর ভালবাসা ও প্রাণের টান এতটুকু কমেনি। পাশ্চাত্য সমাজ জীবনের ভোগবাদী সংস্কৃতির স্রোতে গা ভাসিয়ে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে নিজেকে সঁপে দেননি।

কেমিস্ট্রিতে পিএইচডি লাভ করার পর লোভনীয় চাকরির দিকে ধাবিত না হয়ে ব্রিটিশ সরকারের বেকার ভাতা নিয়ে টানাপোড়েনের জীবন গ্রহণ করে দেশ ও জাতির জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। জুম্ম জাতির সংগ্রামে নিজেকে সঁপে দেয়ায় ব্যক্তি জীবনে ড. দেওয়ান বিয়েও করেননি। যুক্তরাজ্য সরকারের বরাদ্দ করা দু' কামরা বিশিষ্ট একটি ছোট্ট ঘরে সাদাসিধে জীবনযাপন করেন তিনি। তিনি নিরিবিলি জীবনে অভ্যস্ত।

ড. আর এস দেওয়ান ৭ জানুয়ারি ১৯৩২ সালে বর্তমান খাগড়াছড়ি জেলার খবংপয্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রমেশচন্দ্র দেওয়ান ও মাতা চন্দ্রমুখী দেওয়ান। পিতামাতার চার পুত্র ও তিন কন্যা সন্তানের মধ্যে তিনি ষষ্ঠ। পিতা-মাতার স্বপ্ন ছিলো বড় হয়ে তিনি একদিন বংশের নাম উজ্জ্বল করবেন। তাই তাঁর মা-বাবা তাঁকে আদর করে ডাকতেন কুলকুসুম। বড় হয়ে তিনি তাই হয়েছেন। তাঁর লেখাপড়া শুরু হয় খবংপয্যা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ছাত্রজীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। তৎসময়ে দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম হয়ে তিনি সরকারি বৃত্তি লাভ করেন। খবংপয্যা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২য় শ্রেণি পাশ করার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম শিক্ষাবিদ, সংগ্রামী ও প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব চিত্ত কিশোর চাকমা তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত মহাপ্রুম এমই স্কুলে ছোটবেলায় ড. দেওয়ানকে নিয়ে আসেন এবং সেখানে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি করান।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কর্ণধার মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার পিতা চিত্ত কিশোর চাকমা ছিলেন ড. আর এস দেওয়ানের আপন ভগ্নিপতি। পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষার আলো বিস্তার সাধনের ক্ষেত্রে অগ্রণী পথিকৃৎ স্কুল ইন্সপেক্টর কৃষ্ণ কিশোর চাকমা ছিলেন তাঁর ভগ্নিপতির বড়ভাই। কৃষ্ণ কিশোর চাকমা ও চিত্ত কিশোর চাকমা দুই ভাই পার্বত্যাঞ্চলের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার মশাল জ্বালানোর কাজ কার্যত সূচনা করেন এ মহাপুরম থেকে। তাই মহাপুরমকে পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষার আলো বিস্তারের সুতিকাগার বললেও অত্যুক্তি হবে না। চিত্ত কিশোর চাকমা তৎসময়ে মহাপ্রুম মিডল ইংলিশ স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।

মহাপ্রুম মিডল ইংলিশ স্কুল থেকে ষষ্ঠ শ্রেণিতে প্রথম হয়ে ড. দেওয়ান আবার সরকারি বৃত্তি লাভ করেন। এরপর তিনি রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯৫২ সালে বিজ্ঞান বিভাগে মেট্রিক পাশ করেন। তিনি সেসময় প্রথম বিভাগে প্রথম হয়েছিলেন। সে সময় বিদ্যালয়ে তাঁর সহপাঠী ছিলেন খাগড়াছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের একসময়ের স্বনামধন্য প্রথিতযশা শিক্ষক নবীন কুমার ত্রিপুরা (খাগড়াছড়ি), বিশিষ্ট সমাজসেবক কংলাচাই চৌধুরী (খাগড়াছড়ি), মৃনাল কান্তি চাকমা (খবংপয্যা) ও ডা. সুব্রত চাকমা (রাঙ্গামাটি) প্রমুখ। ডা. বাবুল কান্তি চাকমা বলেছেন, তাঁর পিতা মৃগাঙ্ক শেখর চাকমা, ড. মানিক লাল দেওয়ান, পূর্ণেন্দু বিকাশ চাকমা (গৈরিকা বাপ), ডা. সুদেন্দু বিকাশ চাকমা, প্রফেসর বাঞ্চিতা চাকমার পিতা ছিলেন ড. আর এস দেওয়ানের সহপাঠী।

মেট্রিক পাশ করার পর চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে আইএসসিতে ভর্তি হন এবং সেই কলেজ থেকে ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রথম ডিভিশনে আইএসসি পাশ করেন। আইএসসি পরীক্ষার প্রাক্কালে তাঁর এক বন্ধু কোন এক অজ্ঞাত কারণে তাঁকে ক্ষতি করার চেষ্টা করেন বলে তিনি জানান। পরীক্ষার ঠিক কয়েকদিন আগে ড. দেওয়ানের পিতা মারা গেছেন এই মর্মে টেলিগ্রাম এসেছে বলে তাঁর সেই বন্ধু তাঁকে মিথ্যা সংবাদ জানিয়ে দেন। ফলে পরীক্ষা না দিয়ে বাড়ি যাওয়াতে নির্ধারিত বছরে তাঁর পরীক্ষা দেয়া সম্ভব হয়নি। তার পরবর্তী বছরে তাঁর পরীক্ষা দিতে হয়েছে।

এরপর তিনি ঢাকাস্থ আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হন। উক্ত প্রতিষ্ঠানে দুই বছর পর্যন্ত পড়ার পর পাঠ্য বিষয়টির প্রতি মনোযোগী হতে না পারায় কোর্স সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে

১৯৫৭ সালে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ছেড়ে দেন। ঐ বছরই কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান UTAH Company-তে চাকরি গ্রহণ করেন। লেখাপড়ার প্রতি প্রবল আগ্রহের কারণে উক্ত চাকরিতেও তিনি মন বসাতে পারেননি। বছর খানেক চাকরি করার পর চাকরি ছেড়ে দিয়ে ১৯৫৮ সালে তিনি কেমিস্ট্রি অনার্সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৬১ সালে অনার্স এবং ১৯৬২ সালে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন।

অধ্যয়ন শেষে ১৯৬৩-৬৪ সালে তিনি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. মুহাম্মদ কুদরত-ই-খুদা'র অধীনে চাকরি করেন। রাজনীতির সাথে যুক্ত থাকার কারণে ছাত্রজীবন থেকে তাঁর উপর গোয়েন্দাদের কড়া নজরদারি ছিল বলে জানা যায়। সেসময় ড. মুহাম্মদ কুদরত-ই-খুদার কাছে গোয়েন্দারা ড. আর এস দেওয়ানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র-বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ আনে। ফলে এক পর্যায়ে ড. মুহাম্মদ কুদরত-ই-খুদা তাঁকে চাকরি থেকে পদত্যাগ করতে বলেন। এতে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি পদত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। তিনি রাষ্ট্র-বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেন। ড. মুহাম্মদ কুদরত-ই-খুদাকে এই অভিযোগের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করে তিনি আদালতে যাওয়ার কথা বলেন। সেসময় জুম্ম ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন সরকারের পক্ষে ডিআইবি কাজে যুক্ত ছিলেন বলে তিনি জানান। তারাও তাঁর বিরুদ্ধে এ ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক অভিযোগ নিয়ে আসতে পারে বলে তিনি সন্দেহ করেন।

এ সময় তাঁর আনীত অভিযোগের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি ডিআইবি'র ডিরেক্টর (জাতিতে পাঞ্জাবী)-এর সাথে দেখা করেন। ঐ কর্মকর্তা তাঁর সাথে খুবই রূঢ় ব্যবহার করেন এবং বিভিন্ন ভয়ভীতি প্রদর্শন করেন। এমন আচরণ করেন যেন পারলে সে মুহূর্তে ড. দেওয়ানকে তিনি মেরে ফেলতেন এমন ভাব দেখান।

রাঙ্গামাটিতে লেখাপড়ার সময় থেকে তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন বলে তিনি জানান। চট্টগ্রামে পড়ার সময় তিনি জুম্ম (পাহাড়ি) স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনের সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। তাঁকে চিত্ত কিশোর চাকমা, চারু বিকাশ চাকমা, সুধাংশু শেখর চাকমা, সুরেশ্বর চাকমা, সলিল রায় সহ তাঁর অনেক শিক্ষক ও গুণগ্রাহী তাঁকে রাজনীতিতে যুক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন বলে তিনি জানান।

ড. দেওয়ান জানান, মহাপ্রুম মিডল ইংলিশ স্কুলের হেড মাস্টার চিত্ত কিশোর চাকমা তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন। তিনি ছিলেন তাঁর একাধারে শিক্ষক ও ভগ্নিপতি। তিনিই ড. দেওয়ানকে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করেন। সেজন্য তাঁকে ভালভাবে লেখাপড়া করতে উৎসাহ যুগাতেন। সামন্ত ও বিজাতীয় শাসন-শোষণে জুম্ম জাতি নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য রাজনীতিতে যুক্ত হতে ড. দেওয়ানকে তিনি পরামর্শ দিতেন। ড. দেওয়ান মনস্থ করেন যে, আগে অনার্স-মাস্টার্স শেষ করি। তারপর বিলেতে যাবো। সেখান থেকে কাজ করতে সুবিধা হবে। আন্তর্জাতিক প্রচারণার কাজ চালাতে সহজ হবে বলে তিনি পরিকল্পনা করেন।

তাঁর শিক্ষাগুরু চিত্ত কিশোর চাকমার কাছ থেকে ড. দেওয়ান এই শিক্ষালাভ করেছেন যে, দেশ-জাতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। তাঁর জীবনে নানা ক্ষেত্রে তিনি এই শিক্ষাগুরুর কাছ থেকে আলোকিত হয়েছেন বলে তিনি জানান। তিনি এই দীক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন যে, 'জাতিকে সেবা করাই হলো একজন ব্যক্তির অন্যতম আসল কাজ'। মহাত্মা গান্ধী, জওহর লাল নেহেরুসহ অনেক মনীষীর বই পড়ে তিনি রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং রাজনীতি করতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন।

> “ ড. দেওয়ান খুবই সজ্জন ও পরোপকারী ব্যক্তি। সরকারের ভাতা থেকে টাকা বাঁচিয়ে কেবল আন্তর্জাতিক প্রচারণার কাজে ব্যয় করেন না, তিনি আত্মীয়-স্বজন ও দুঃস্থ মানুষের আপদে-বিপদেও সাহায্য দিয়ে থাকেন।

চিত্ত কিশোর চাকমা তাঁকে আইন পড়তে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু আইনের চেয়ে বিজ্ঞান বিভাগে পড়ার আগ্রহ বেশি ছিল তাঁর। সেজন্য তিনি অর্গানিক কেমেস্ট্রিতে উচ্চ শিক্ষা নিয়েছেন। নব্বই দশকের দিকে যখন তিনি ভারতে যান, তখন তিনি তাঁর শিক্ষাগুরু চিত্ত কিশোর চাকমাকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সর্বশেষ একটি চিঠি লিখেন এবং অবহিত করেন, তাঁর উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি জাতির জন্য কাজ করে চলেছেন।

কেমেস্ট্রিতে এমফিল করার জন্য তিনি ১৯৬৭ সালের ৩ নভেম্বর বিলেতে পাড়ি জমান। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কুইন্স এলিজাবেথ কলেজে তিনি এমফিল শুরু করেন। পড়াশুনার খরচ যোগানোর জন্য তিনি Bush Boake Allen নামক একটি কোম্পানীতে চাকরি নেন। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত Lt. Col. Henry B Heath নামক ব্যক্তি তাঁকে সেই চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। উক্ত সেনা কর্মকর্তা তখন ঐ কোম্পানীর ম্যানেজার ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উক্ত সেনা কর্মকতা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিয়োজিত ছিলেন। যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য তিনি ব্রিটিশ সরকারের Member of British Empower উপাধি লাভ করেন।

ড. দেওয়ান স্মরণ করেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁর ভাই বিনোদ লাল দেওয়ান, তাঁর ভগ্নিপতি খগেন্দ্র লাল চাকমা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। যুদ্ধের পর বিনোদ লাল দেওয়ানকে বার্মা সার্ভিসে চাকরি প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জুম্মরা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে অনেক সহায়তা করেছিল। খাদ্য, গোলা-বারুদ, নানা জিনিসপত্র বহনের জন্য তৎসময়ে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী জুম্মদের সহায়তা নিয়েছিল। ড. দেওয়ান জানান যে, একজন ব্যক্তির ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ২৫ কেজি ওজনের জিনিস দৈনিক ২৫ কিলোমিটার পর্যন্ত বহন করতে হতো। ড. দেওয়ানকে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী হিসেবে পরিচয় পাওয়ার পর Lt. Col. Henry B Heath জুম্মদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ড. দেওয়ানের জন্য Bush Boake Allen নামক কোম্পানীতে চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। তিনি ঐ কোম্পানীতে ছয় বছর চাকরি করেন।

ড. দেওয়ান কুইন্স এলিজাবেথ কলেজে Dr. Terry A. Rohan-এর অধীনে ১৯৬৮ সালে এমফিলে ভর্তি হন। এমফিল করতে তাঁর চার বছর লাগে। এমফিল করার সময় তিনি জুম্মদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। সেসময় ১৯৭৪ সালে সরকারের পার্লামেন্টারি প্রতিনিধি হিসেবে কমনওয়েল্থ সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষে লন্ডন সফর করলে তৎকালীন জাতীয় সংসদ সমস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তাঁর সাথে যোগাযোগ করেন এবং ড. দেওয়ানকে জুম্ম জনগণের আন্দোলনের পক্ষে আন্তর্জাতিক ক্যাম্পেইন চালানোর আহ্বান জানান। তাঁর আহ্বানে তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে সার্বক্ষণিকভাবে আন্দোলনের কাজে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন।

এমফিল শেষ করে ১৯৭৫ সালে Salford University-তে পিএইচডি শুরু করেন তিনি। পাশাপাশি তিনি জোর কদমে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের পক্ষে ক্লান্তিহীন প্রচারাভিযান চালাতে থাকেন। Bush Boake Allen কোম্পানীতে চাকরি করার সময় জমাকৃত টাকা দিয়ে একদিকে তিনি পিএইচডি'র পড়াশুনার খরচ, অন্যদিকে ক্যাম্পেইনের খরচ চালাতে থাকেন। একাধারে পিএইচডি'র জন্য নিবিড় পড়াশুনা এবং ক্যাম্পেইনের জন্য দিন-রাত কাজ করার ফলে সেসময় তাঁর স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছিল। অপরপক্ষে জমানো টাকাও প্রায় শেষ হয়ে আসে। ক্যাম্পেইনের অত্যাধিক কাজের চাপে তাঁর পিএইচডি পড়াশুনাও বিঘ্নিত হওয়ার উপক্রম হতে থাকে।

এমতাবস্থায় তাঁর অধ্যাপক যাঁর অধীনে তিনি Salford University-তে পিএইচডি করছিলেন তিনি আর এস দেওয়ানকে পিএইচডি'র গবেষণাপত্র (থেসিস) জমা দিয়ে তাড়াতাড়ি পিএইচডি কোর্স শেষ করতে পরামর্শ দেন। আর্থিক অনটনের কথা জানার পর তাঁর সেই অধ্যাপক মহোদয় ব্রিটিশ সরকারের সামাজিক সুরক্ষা ভাতার (Social Benefit) জন্য আবেদন করতেও আর এস দেওয়ানকে পরামর্শ প্রদান করেন। সেই অধ্যাপকের পরামর্শ মোতাবেক ড. দেওয়ান তাঁর গবেষণাপত্র দ্রুত শেষ করে জমা দেন এবং ১৯৮০ সালে তিনি পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর গবেষণাপত্রের মূল কাজ ছিল আদা, এলাচি ইত্যাদির Perfume and Flavour-এর উপর। অন্যদিকে তাঁর আবেদন মূলে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে সামাজিক সুরক্ষা ভাতা মঞ্জুর করে। সেসময় তিনি সপ্তাহে ৬ পাউন্ড সামাজিক সুরক্ষা ভাতা পেতেন। বর্তমানে তিনি সপ্তাহে ১৩৮ পাউন্ড ভাতা লাভ করে থাকেন বলে জানা যায়।

সেসময় সামাজিক সুরক্ষা ভাতা পাওয়ার পর তিনি পরিমিত খাদ্য কিনে খেতে পারতেন। ফলে ধীরে ধীরে তাঁর স্বাস্থ্য উন্নতি হতে থাকে। এর আগে অর্থের অভাবে তিনি দুধ কিনতে পারতেন না। কেবল রুটি খেয়ে আধা পেটা অবস্থায় থাকতে হতো। তিনি জীবনে ধুমপান করেন না। পাশ্চাত্য জীবনে থেকেও তিনি কখনোই মদ পান করেন না। সিনেমা দেখেন না। কৃচ্ছ্রতা সাধন করে পরিমিত খরচে তাঁর জীবন নির্বাহ করতে হয়।

তিনি সেসময় আন্তর্জাতিক স্তরে আন্দোলনের পক্ষে প্রচারণা চালানোর লক্ষে একটি তহবিল গঠনের জন্য প্রবাসী জুম্মদের প্রতি আহ্বান জানান। দু'একজন ছাড়া অধিকাংশ প্রবাসী জুম্ম এগিয়ে আসেননি। সবাই নিজের পরিবার নিয়ে ব্যস্ত থাকেন বলে তিনি জানান। নাম প্রকাশ না করে ড. দেওয়ান বলেন যে, এমনকি জনৈক ব্যক্তি তাঁকে এই ক্যাম্পেইনের কাজ ছেড়ে দিতে বলেন এবং চাকরি করতে পরামর্শ প্রদান করেন। সেসময় আন্তর্জাতিক প্রচারাভিযানের জন্য বছরে ২৫০০ থেকে ৩০০০ পাউন্ড প্রয়োজন হতো। সেই সামান্য টাকাও প্রবাসী জুম্মরা দিতে কুণ্ঠাবোধ করতো বলে তিনি হতাশা প্রকাশ করেন। তবে তিনি স্বীকার করেন যৎসামান্য হলেও ক্যাম্পেইনের খরচ যোগার করতে দু'একজন জুম্ম এগিয়ে

এসেছিলেন। বস্তুত ব্রিটিশ সরকারই পরোক্ষভাবে তাঁকে ক্যাম্পেইনের খরচ যুগিয়েছিলেন বলে ব্রিটিশ জনগণের কাছে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে যে সামাজিক সুরক্ষা ভাতা পেতেন তা থেকে বাঁচিয়ে তিনি আন্তর্জাতিক ক্যাম্পেইনের খরচ যুগিয়ে চলেছেন।

আন্তর্জাতিক ক্যাম্পেইনের ক্ষেত্রে তিনি লন্ডনের বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের সহায়তা লাভ করেন। তিনি প্রথম পর্যায়ে যোগাযোগ করেন এন্টি-স্লেভারী সোসাইটি (Anti-Slavery Society)-এর সাথে। সেসময় এ সংগঠনের Mr. Peter Devis নামে একজন মানবাধিকার কর্মী তাঁকে বিশেষভাবে সহায়তা করেন। এছাড়া Quaker Peace Service (QPS) নামে একটি সংগঠনের নাম তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তাঁর অনুরোধে লন্ডনস্থ ছচব অফিসে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সারভাইভাল ইন্টারন্যাশনাল, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ইত্যাদি সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আন্তর্জাতিক প্রচারণার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন বলে তিনি জানান। প্রচারণার অংশ হিসেবে জুম্মদের মধ্যে তিনিই প্রথম ১৯৮৪ সালে জেনেভাস্থ জাতিসংঘের মানবাধিকার হাই কমিশনারের সদর দপ্তরে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and Protection of Minorities এর অধীন Working Group on Indigenous Populations (WGIP)-এর অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর ভাষণ প্রদান করেন। সেসময় শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাথেরোও উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন বলে জানা যায়।

তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের লর্ডসভার সদস্য Lord Avebury-এর কাছে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠাতেন। লর্ড এভেবুরিও তাঁর রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রচারণার কাজ চালাতেন। চিঠিপত্র আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ বছর ধরে তাঁর সাথে যোগাযোগ থাকলেও ৭/৮ বছর (সম্ভবত ২০০৮/২০০৯ সালের দিকে) আগে লর্ড এভেবুরির সাথে তাঁর প্রথম ও শেষ বার দেখা হয় বলে জানা যায়।

সত্তর ও আশি দশকের দিকে প্রাথমিক অবস্থায় যখন তিনি আন্তর্জাতিক প্রচারণার কাজে নেমে পড়েন এবং ব্রিটিশ সরকারের সাথে যোগাযোগ করেন তখন ব্রিটিশ সরকারের অনেকে তাঁর পরিচয় জানতে চাইতেন বা পরিচয়পত্র (Accreditation) দেখাতে বলতেন। পরে জনসংহতি সমিতি তাঁকে সমিতির মুখপাত্র (Spokesman) হিসেবে পরিচয়পত্র প্রদান করে। এই পরিচয়পত্র পাওয়ার ফলে তাঁর পক্ষে ব্রিটিশ সরকারসহ ইউরোপে ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা সহজ ও সুবিধা হয়েছে বলে তিনি জানান। এজন্য তিনি জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বের প্রতি, বিশেষ করে জনসংহতি সমিতির বর্তমান সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। আন্তর্জাতিক প্রচারণার ক্ষেত্রে শ্রী লারমা থেকে তিনি নানা উপায়ে নিয়মিত নির্দেশনা পেতেন বলে জানা যায়।

তিনি জানান, যদিও বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল, কিন্তু আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে সেই স্বপ্ন পূরণ করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলের যে উদ্ভিদ ভান্ডার রয়েছে সেসব উদ্ভিজ্জ প্রাণের উপর তাঁর গবেষণা করার প্রবল আগ্রহ ছিল। তারই অংশ হিসেবে তাঁর পিএইচডি থেসিসও নিয়েছিলেন আদা, এলাচি ইত্যাদির Perfume and Flavour-এর উপর। তিনি নিজেকে নবিশ বিজ্ঞানী হিসেবে ভাবতে পছন্দ করেন। তিনি কাঁচা পিয়াজের Flavour-এর উপর পেটেন্ট করেন। তাঁর গবেষণায় পিয়াজের Flavour-কে তিনি আলাদা করতে সক্ষম হন।

বাল্যকালে একটি ঘটনার কারণে রসায়নের (কেমেস্ট্রি) প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মায়। তাঁর এক নিকট আত্মীয় বসুন্ধরা দেওয়ান ছোটবেলায় খাগড়াছড়ি স্কুলে পড়ার সময় হাঁটু ব্যাথায় ভোগেন। ব্যাথায় তিনি হাঁটতেও পারতেন না। ফলে তাঁর স্কুলে যাওয়াও বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এ সময় বসুন্ধরা দেওয়ানের মা (বিনেত্রা মা) তাঁর মেয়ের হাঁটু ব্যথার চিকিৎসার জন্য একজন বৈদ্য নিয়ে আসেন। ঐ বৈদ্য একটি গাছের শেকড় দেন। ঐ গাছের শেকড় ব্যবহার করে বসুন্ধরা দেওয়ানের হাঁটুর ব্যাথা সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য হয়। ঐ গাছের শেকড় ছিল বরনা গাছের। এ থেকে ড. দেওয়ানের ধারণা হয় যে, জঙ্গলের গাছ-গাছালিতে প্রচুর ঔষধি গুণ রয়েছে যা অনাবিস্কৃত রয়েছে। এগুলো বৈজ্ঞানিক উপায়ে গবেষণা করা গেলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে কাজে লাগানো যায় বলে তিনি ভাবতেন। এ থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি রসায়ন বিষয়ে লেখাপড়ার আগ্রহী হয়ে উঠেন বলে জানা যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে ক্যাম্পেইনের জন্য বৃদ্ধ বয়সেও তিনি এখনো নিয়মিত লাইব্রেরিতে যান। পত্রপত্রিকা পড়ে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য নেয়ার ও জানার চেষ্টা করেন। তার ভিত্তিতে রিপোর্ট তৈরি করে এখনো নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রচারকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

কৃচ্ছ্রতা সাধনের অংশ হিসেবে তাঁর ঘর থেকে ড. দেওয়ান বৈদ্যুতিক সংযোগও বিচ্ছিন্ন করেছেন। বিদ্যুৎ বাবদ খরচ বাঁচিয়ে উক্ত টাকা তিনি ক্যাম্পেইনের জন্য ব্যয় করেন। শীত প্রধান দেশে বিদ্যুৎ ছাড়া, হিটার বিহীন অবস্থায় কিভাবে জীবন কাটান বলে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান যে, জনসংহতি সমিতির সদস্যরা তীব্র শীতে রাত-বিরাতে জঙ্গলে ছড়াছড়িতে

যদি থাকতে পারে ও যাতায়াত করতে পারে, তাহলে তিনি বিদ্যুৎ ও হিটার ছাড়া ঘরের মধ্যে থাকতে পারবেন না কেন, সেই কষ্ট সহ্য করতে পারবেন না কেন এমন উল্টো প্রশ্ন করেছিলেন। বুক আর মাথা গরম রাখলে শীত সহ্য করা যায় বা শীত থেকে বাঁচা যায়। তাই তিনি মাথায় গরম উলের টুপি এবং শরীরে একসাথে গরম কাপড়ের গেঞ্জি, শার্ট, সুয়েটার, জেকেট ও ওভারকোট পরে থাকেন। বেশি শীত করলে তিনি লাইব্রেরিতে গিয়ে থাকেন।

তিনি খুবই সজ্জন ও পরোপকারী ব্যক্তি। সরকারের ভাতা থেকে টাকা বাঁচিয়ে কেবল আন্তর্জাতিক প্রচারণার কাজে ব্যয় করেন না, তিনি আত্মীয়-স্বজন ও দুঃস্থ মানুষের আপদে-বিপদেও সাহায্য দিয়ে থাকেন। সামাজিক উদ্যোগে তিনি সর্বাগ্রে এগিয়ে আসেন। প্যারিসে জুম্মরা একটি বৌদ্ধ মন্দির স্থাপনের উদ্যোগ নিলে সেখানেও তিনি একটা বড় অংকের অর্থ দান করেছেন করে জানা গেছে।

তিনি ঘরে রান্না-বান্না করেন না। রুটি, কাঁচা শাখ-সবজি, ফল-মূল খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করেন। কাঁচা শাখ-সবজি, ফল-মূল স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী বলে জানান। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, রান্না না করে কাঁচা খেলে তার খাদ্যগুণ নষ্ট হয় না এবং স্বাস্থ্য ভালো থাকে। তিনি মসুর ডাল রান্না না করে পানিতে ভিজিয়ে কাঁচা খেয়ে থাকেন। এটা স্বাস্থ্যসম্মত বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, পাকা কলা বাকলসহ খেলে স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকার হয়। পাকা কলার বাকল খেলে Bowel দূরীভূত হয়। ইড়বিষ দূরীভূত হলে ক্যানসার হতে পারে না। Bowel শরীরে ক্যানসার বাসা বাঁধতে সহায়তা করে বলে তিনি জানান। তাঁর জীবনে তিনি এভাবে কাঁচা খেয়ে সুস্থ ও নিরোগ জীবনযাপন করছেন বলে দাবি করেন। আর টাকার অভাবে মাছ-মাংস খাওয়ার সুযোগ নেই বলে তিনি জানান। তার বদলে তিনি নিয়মিত বাদাম খান বেশি করে। পশু-পাখির জন্য যে বাদাম তা খুবই সস্তা এবং তাতে প্রোটিন ও প্রচুর খাদ্যগুণ রয়েছে। তাই তিনি পশু-পাখির জন্য যে বাদাম বিক্রি করা হয় সেই বাদাম কিনে খান। এতে তাঁর শরীরে শক্তি বাড়ে, তাঁর স্বাস্থ্য ভাল থাকে, অসুখ-বিসুখ হয় না বলে তিনি মনে করেন।

তিনি এখনো আন্তর্জাতিক ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে ৩০০ জনকে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠান, চিঠি লেখেন। ম্যানুয়েল টাইপ রাইটার-এ টাইপ করে পোস্টে তিনি সেসব রিপোর্ট পাঠিয়ে থাকেন। সরকারের বরাদ্দকৃত এপার্টমেন্টের দু'টি কামরা ও একটি কিচেন রয়েছে। ঐ দু'টি কামরা তাঁর আন্তর্জাতিক ক্যাম্পেইনের দলিলপত্রাদিতে ঠাসা। যেহেতু তাঁর কোন আলমারি ও বইয়ের তাক নেই তাই এসব দলিলপত্রাদি তিনি অত্যন্ত যত্নের সাথে মেঝেতে সুবিন্যস্তভাবে সাজিয়ে রেখেছেন। ব্রিটিশ সরকার থেকে পাওয়া সামাজিক সুরক্ষা ভাতা থেকে টাকা বাঁচিয়ে ক্যাম্পেইনের জন্য তিনি খরচ করেন। টাকা বাঁচানোর জন্য নিজেই নিজের চুল কাটেন। নিজের কাপড় নিজে ধুয়ে থাকেন, সেলাই করে থাকেন। তথ্য সংগ্রহ ও রিপোর্ট তৈরি করার জন্য নিয়মিত লাইব্রেরিতে যান। টাইপ করে রিপোর্ট তৈরির জন্য তাঁর অধিকাংশ সময় ব্যয় করতে হয়। একাই তাঁর পক্ষে সব কাজ করে যেতে হয়। কেউ নেই যিনি তাঁকে সেই কাজে সাহায্য করবে। তাই তাঁর সারাদিন ব্যস্ততার মধ্যে সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। আশির কোটায় ধাক্কা দেয়া এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি এখনো এক টগবগে তরুণের মতো ক্লান্তিহীন প্রত্যয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের জন্য নীরবে কাজ করে চলেছেন।

লেখকের সাথে এক সাক্ষাৎকার প্রদান কালে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আপোষহীন আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। জনসংহতি সমিতির আন্দোলন সঠিক পথে এগিয়ে যাচ্ছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। জুম্ম জনগণের ঐক্য-সংহতি অটুট রাখতে পারলে এবং সবাই একসাথে কাজ করতে পারলে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অধিকার অর্জিত হবেই হবে বলে তিনি দৃঢ় মত ব্যক্ত করেন। তাঁর ঘরে গচ্ছিত আন্তর্জাতিক স্তরে প্রচারাভিয়ান সংক্রান্ত দলিলপত্রাদি তিনি জনসংহতি সমিতির নিকট দিয়ে যেতে চান বলে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ঐসব দলিলপত্রাদি দিয়ে একটি 'জুম্ম ন্যাশনাল লাইব্রেরি ও মিউজিয়াম' স্থাপন করার স্বপ্ন রয়েছে তাঁর। এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে তিনি জনসংহতি সমিতিকে আহ্বান জানান।

রক্তেভেজা সীমারেখা

প্রধীর তালুকদার

ব্যারিস্টার স্যার সিরিল রেডক্লিফ, যাকে ভারত বিভক্তির জন্য বাউন্ডারি কমিশনের চেয়ারম্যান করে দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৪৭ সালের জুলাইয়ের ৮ তারিখ ভারতের মাটিতে পা রাখেন রেডক্লিফ । সম্ভবত ১২ আগস্ট ১৯৪৭, অনেকটা অন্ধের মতো দেশভাগের সীমারেখা টেনে দেন। সীমারেখা টানা যেদিন শেষ হয়, ঠিক পরের দিন বৃটেনে চলে যান। সরকারের তরফ থেকে যে ৩,০০০ পাউন্ড সম্মানী হিসেবে দেয়া হয়েছিল তাও তিনি প্রত্যাখান করেন। বিশ্বের অর্থনৈতিক মন্দার সেই সময়ে এই অর্থ নেহায়েত কম নয়। স্ত্রী এনটোনিয় আক্ষেপ করেছিলেন রেডক্লিফ ৩,০০০ পাউন্ড অর্থ গ্রহণ করেননি বলে।

একবার আক্ষেপ করে স্যার সিরিল রেডক্লিফ বলেছিলেন, 'কাজটি সম্পন্ন করতে আমার হাতে যা সময় দেয়া হয়েছিল তা অতি নগণ্য। এতে আমি এর চেয়ে ভালো করতেই পারতাম না। আমাকে যদি ২ বা ৩ বছর সময় দেয়া হতো আমি নিশ্চয়ই অধিকতর গ্রহণযোগ্য ভালো করতে পারতাম।' কাজটি আর কিছু নয়- ভারত আর পাকিস্তান দু'টি দেশের সীমারেখা টানা। ইতিহাসে যার নাম 'রেডক্লিফ লাইন'। দ্যা ব্লাডি বর্ডার লাইন। রক্তেভেজা সীমারেখা।

স্যার সিরিল রেডক্লিফ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজরা রণক্লান্ত। অর্থনৈতিক মন্দার ভয়াবহ পরিস্থিতি। একেতো ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্রতা, অন্যদিকে যুদ্ধে নাজেহাল অবস্থা। কাজেই ভারত উপমহাদেশে নিজেদের উপনিবেশ আর টিকিয়ে রাখা অসম্ভব। ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স এ্যাক্ট প্রণয়নের মাধ্যমে বৃটিশ পার্লামেন্ট সিদ্ধান্ত নেয় ভারত উপমহাদেশকে দু'টি দেশে ভাগ করে স্বাধীনতা দিয়ে তাদের দু'শো বছরের উপনিবেশ গুটিয়ে নেবে। একটি মুসলিম অধ্যুষিত ডোমিনিয়ন অব পাকিস্তান, অন্যটি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারত সৃষ্টির পর কেটে গেলো বহু বছর। ১৯৬৬ সালের এক দিপ্রহর। লন্ডনের বন্ড স্ট্রিটে নিজের ওয়েটিং রুমে স্ত্রী এনটোনিয়া সহ রেডক্লিফকে দেখা গেল। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল- ক্রিং ক্রিং ক্রিং। রিসিভার তুললেন রেডক্লিফ নিজেই। 'হ্যালো- আমি কি সিরিল জন রেডক্লিফের সাথে কথা বলছি?' টেলিফোন লাইনের অপর দিক থেকে প্রশ্ন। রেডক্লিফ জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ আমি সিরিল জন রেডক্লিফ। ডব্লিউ এইচ অওডেন নামে কেও? ও আচ্ছা? নিশ্চয় পড়ে দেখব কবিতাটি।'

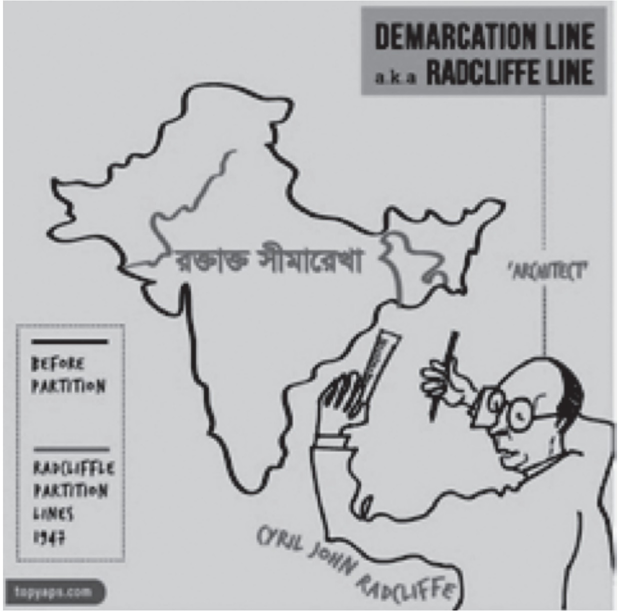

এক সাংবাদিক স্যার সিরিল জন রেডক্লিফকে ফোন করে জানান, 'পত্রিকায় ডব্লিউ এইচ অওডেন, দেশভাগ সম্পর্কে আপনাকে নিয়ে একটি কবিতা রচনা করেছেন।'

জীবন সায়াহ্নে স্যার সিরিল রেডক্লিফ তখন প্রায় দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। ফোনটি পেয়ে রেডক্লিফ স্ত্রী এনটোনিয়াকে উৎসুক হয়ে বলে উঠেন, 'দেখতো, আমাকে নিয়ে ডব্লিউ এইচ অওডেনের একটি কবিতা ছাপানো হয়েছে পত্রিকায়। ব্যাপারটি সত্যিই বড় সম্মানের নয় কি? তুমি কি পড়েছো?' স্ত্রী সোহাগভরা কণ্ঠে স্বামীর হাত ধরে জবাব দেন, 'হ্যাঁ পড়েছি বৈ কি! ডার্লিং এদিকে এসো। বসো।' তাহলে? পাল্টা আগ্রহ প্রকাশ করলেন রেডক্লিফ। স্ত্রী জবাবে বললেন, 'এটি কোন সুন্দর কবিতা নয় গো, নয় কোন প্রশংসার।' স্ত্রীর কথা শুনে চমকে উঠেন রেডক্লিফ। ম্যাগ্নিফাইয়িং গ্লাসে পড়ার চেষ্টা করলেন রেডক্লিফ। ব্যর্থ হয়ে স্ত্রীকে বললেন, 'তুমি পড়ে শোনাও তো।' কবিতার বাংলারূপ হতে পারে এমন---

অন্ততঃ পক্ষপাতহীন ছিলেন যখন তার মিশনে গেলেন।

যে দেশটিকে ভাগ করতে তাকে বলা হল, সে দেশ দেখেননি কখনো,
ধর্মান্ধ দুই বিবদমান জাতি, পার্থক্য তাদের খাদ্যাভাসে,
অসঙ্গতি ঈশ্বর বিশ্বাসে।
সময়! লন্ডনে ওরা ব্যাখ্যাও দিল অতি সংক্ষিপ্ত।
পারস্পরিক সমঝোতা আর যুক্তির বিতর্ক
করাও অনেক দেরী হয়ে গেছে।
দ্বি-খন্ডনের মাঝেই শুধু সমাধান। পরামর্শের জন্য
আপনাকে দু'জন মুসলিম, দু'জন হিন্দু মোট
চারজন বিচারক দিতে পারি। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
আপনারই হাতে।
তিনি কাজে নিয়োজিত হলেন, কোটি মানুষের ভাগ্য
নির্ণয়ে। তার হাতে
দেয়া হলো এক সেকেলে মানচিত্র আর নিশ্চয়ই ত্রুটিপূর্ণ
জনসংখ্যার খতিয়ান। অথচ তা খতিয়ে
দেখার সময় নেই, অবকাশ নেই বিতর্কিত অঞ্চল
সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করারও। ভয়াবহ গরম
আর আমাশয়ের আঘাতে তিনি ক্লান্ত....

এই লাইনে তার একটু খটকা লাগল। রেডক্লিফ ভারাক্রান্ত হলেন। প্রায় কান্না জড়ানো তার কণ্ঠ। 'পড়ে যাও'। স্ত্রী এনটোনিয়া আওড়াতে লাগলেন কবিতার পরবর্তী লাইন–

তথাপি, কয়েক সপ্তাহে হলো অসাধ্য সাধন, সীমারেখা আঁকা হলো,
দ্বিখণ্ডিত একটি উপমহাদেশ, ভালো মন্দের দোলাচলে।
পরদিনই লন্ডনের পথে জাহাজে পাড়ি দেন তিনি,
সহসাই বিষয়টি ভুলে গেলেন, অবশ্যই এক ভালো আইনজীবীর মতো।
ফিরে এসে আদৌ শংকিত হননি, কর্তৃপক্ষকে যখন রিপোর্ট করেন।
যদিও তিনি নিশ্চিত অনুতাপে ক্ষত-বিক্ষত।'

কবিতা পড়া শেষ হলে রেডক্লিফের এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে- 'ওফ! রেডক্লিফ লাইন! ডিকি (লর্ডস মাউন্ট ব্যাটেনের ডাক নাম) বলেছিল শিখরা জেনে যাওয়ার আগেই পাঞ্জাবকে ভাগ করতে হবে।'

বোকা স্বামীর কথা শোনার সাথে সাথেই এনটোনিয়া রাগতস্বরে বলে উঠেন, 'ছি! তুমি তো বলবেই এখন ওটা সব ডিকির ভুলে। লন্ডনের বিশপ জিরাল্ড এলিসন ডিকি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন ঠিকই। স্মরণ করে দেখো। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন এমনই চতুর যে তুমি যদি নখ গিলে গলায় আটকে ফেলো সে ঠিকই কর্কস্ক্রু দিয়েই তোমাকে নাচাবে।'

বয়োবৃদ্ধ রেডক্লিফ অসহায়ের সুরে বলে উঠেন, 'ডিকিকে বলেছিলাম তো, ব্যাপারটি হাস্যকর। আমার হাতে মোটেই সময় ছিলো না। রিডিকুলাস আইডিয়া। অন্যদিকে নেহেরু, জিন্নাহ, প্যাটেল সবাই চাইছিলেন ১৫ অগাস্টের মধ্যে দেশভাগ, কাজেই আমি আমার লাইন টেনেছি। ব্যাস।'

তৎক্ষণাৎ এনটোনিয়ার তিরস্কারপূর্ণ প্রতিক্রিয়া– 'হ্যাঁ। হাস্যকর দায়িত্ব, রিডিকুলাস আইডিয়া বটে। তা তুমি কিভাবে সিদ্ধান্ত নিলে? একদিকে পূর্ব পাকিস্তান অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান, এক দেশের মাঝখানে ইন্ডিয়া। পাকিস্তানের পেটের ভেতর এক বিশাল অন্য দেশ ইন্ডিয়া!'

রেডক্লিফের গলায় আহত স্বর– 'আমি তখনই লর্ড চ্যান্সেলরকে প্রশ্ন করেছিলাম। আমাকে কেন? আমি তো কেবলই একজন আইনজীবী, তাছাড়া ইন্ডিয়ায় কখনো যাইনি। তিনি বললেন তোমার দেশের সেবায় তোমাকে করতেই হবে। তবে আমি কিভাবে নিজের দেশকে বলব না? বলতে পারি?' এভাবে গড়াতে থাকে রেডক্লিফ ও তার স্ত্রী এনটোনিয়ার মধ্যে অন্তঃক্ষরণের উত্তেজনাকর বাক-বিতন্ডা।

সূত্র: *ভারতীয় চলচিত্র পরিচালক ও টেলিভিশন বিজ্ঞাপনী ক্ষেত্রে সুপরিচিত রাম মাধবনীর তৈরি 'এই রক্তাক্ত রেখা' (The Bloody Line) নামে দেশভাগে রেডক্লিফ লাইন নিয়ে এক স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি।*

এই সীমারেখা মানব ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জনস্থানান্তর (মাইগ্রেশন) ঘটিয়েছিল। ঘটিয়েছিল রক্তপাতও। আর সেই অতি বিতর্কিত সীমারেখা আজ ৭৩ বছর পরও রক্তে রাঙা রাজনৈতিক হিংসা প্রতিহিংসার ধারা বহাল তবিয়তে জারি রেখেছে। ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান বিভক্তির রক্তঝরা সীমারেখা, আভ্যন্তরীণ আগ্রাসন, অধিকারের আন্দোলন ও আত্মীকরণ (এ্যাসিমিলেশন) আজ এক নিষ্ঠুর বাস্তবতা। অহিংসা মন্ত্রে উজ্জিবিত মহাত্মাগান্ধীর সাথে দেখা হলে রেডক্লিফকে বলেছিলেন, 'দেখো সিরিল, এই দেশভাগ অনেক হিংসার জন্ম দেবেই।'

ঠিক তাই। ২০ লক্ষ মানুষের হত্যাকাণ্ড, ১ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষের দেশান্তর এবং তার পরবর্তী সাম্প্রদায়িক হানাহানি, আগ্রাসন, অধিকারের আন্দোলন ও অস্তিত্ব বিলুপ্তির চলমান ইতিহাস জানলে স্যার সিরিল রেডক্লিফ কি কখনো অনুতপ্ত হতেন? হ্যাঁ অনুতাপে দগ্ধ হয়েছিলেন রেডক্লিফ। আক্ষেপ করেছিলেন, 'আজ আমি শারীরিক চোখের দৃষ্টি হারিয়েছি। প্রায় অন্ধের মতো জীবন কাটাচ্ছি। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই, সেদিন সেই রেখাটি আঁকতে গিয়ে এর চাইতেও অন্ধ ছিলাম। কারণ যে দেশে জীবনে কখনো যাননি, যে দেশের ভূগোল যার অজানা তাকেই কিনা সে দেশ ভাগের রেখা আঁকতে হয়েছে!

দীর্ঘকাল রেডক্লিফ লাইনে দেশভাগের ভয়াবহ ও পীড়াদায়ক পরিণতির কথা অনেক লেখক তাদের বই বা ছবির মাধ্যমে

তুলে ধরলেও সেই বাউন্ডারি কমিশনের এওয়ার্ড-এর ইতিহাস এবং তার প্রক্রিয়ায় জড়িতদের ভূমিকার পুনর্মূল্যায়ন আজ পর্যন্ত কোথাও হয়নি। হেমিস্টিড থিয়েটারের প্রযোজনায়, হাওয়ার্ড ব্রেনটনের লেখা ও হাওয়ার্ড ড্যাভিসের পরিচালনায় নাটক 'ড্রইয়িং দ্যা লাইন'-এর ভূমিকায় লেখা যায়–

লন্ডন। ১৯৪৭ সাল। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে সিরিল রেডক্লিফকে ডেকে পাঠানো হল। তাকে এক অপ্রত্যাশিত কাজে পাঠানো হবে ভারতে যে দেশে সে জীবনে কখনো যাননি। তার হাতে সময় কয়েক সপ্তাহ মাত্র। বৃটেনের বিশাল উপনিবেশ ভারত উপমহাদেশকে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান নামক দুই স্বাধীন সার্বভৌম দেশের সীমারেখা টেনে ভাগ করতে হবে। একেবারেই অপ্রস্তুত রেডক্লিফের স্বভাবের সাথে সংগতিহীন দায়িত্ব বটে। একদিকে ভারতের ভৌগলিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারনা নেই, অন্যদিকে চলতে থাকা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের বিপদ সংকুল আজানা পরিবেশ। রেডক্লিফ সত্যিকার অর্থেই অন্ধ ছিলেন ভারত উপমহাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক আর ভৌগলিক জ্ঞানে।

তবে, 'ড্রয়িং দ্যা লাইন' নামে রচিত হাওয়ার্ড ব্রেনটনের নাটকে রেডক্লিফের চরিত্রকে এমনভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে তিনি একজন সৎ ও নীতিবান মানুষ ছিলেন। উপনিবেশিক বৃটিশের হয়ে দেশভাগের দায়িত্ব পালন করতে এসে রেডক্লিফের ঘটনাবহুল জীবনের অনেক অপ্রকাশিত সত্য আমাদের অজানা রয়ে গেছে। শিমলার ভাইসরয়ের যে বাঙ্গলোয় বসে রেডক্লিফ দেশভাগের লাইন টানছিলেন সেই কক্ষ নিশ্চয়ই অজ্ঞতার অন্ধকারে ঢাকা ছিল, যেমনি করে তার মনের কোণায়ও অনেকটা কষ্টের অন্ধকারও ঘনিয়েছিল সেই সন্ধিক্ষণে। ১২ আগস্ট স্বাধীনতার ঠিক তিনদিন আগে ভারত পাকিস্তান বিভক্তি সীমারেখা চূড়ান্ত হয়ে যায়। তবে বাউন্ডারি কমিশনের রিপোর্ট সরকারিভাবে প্রকাশিত হয় ১৭ আগস্ট ১৯৪৭।

যাইহোক, রেডক্লিফ পরবর্তীতে তার কৃতকর্মের ভুল ও বেদনাদায়ক পরিণতির কথা ভেবে চরমভাবে অনুতপ্ত হয়েছিলেন বলেই হয়তো শেষ পর্যন্ত সরকারের দেয়া পারিশ্রমিক ৩,০০০ পাউন্ড গ্রহণ করেননি, সকল ম্যাপ ও খসড়া ডকুমেন্টসগুলিও ইংলন্ডে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং নিভৃতে পুড়িয়ে নষ্ট করেছিলেন। রেডক্লিফ ভারতে এসে কি দায়িত্ব পালন করে গেছেন সে কাহিনীর বিস্তারিত কিছুই নিজের স্ত্রীকেও পর্যন্ত শোনাননি কোনদিন। একজন দায়িত্ববান বৃটিশ নাগরিক হয়ে রেডক্লিফের ঐতিহাসিক ভুলের খেসারত দিতে গিয়ে যে লক্ষ কোটি মানুষের জীবনে আজ অবধি নতুন উপনিবেশের আগ্রাসনে নিপীড়ন, নির্যাতনের ভিন্ন কাহিনী রচিত হয়ে চলেছে। নির্মম হলেও সত্য যে ১৯৪৭ সালে বহিঃশক্তি বৃটিশ উপনিবেশের সমাপ্তি ঘটে বটে, কিন্তু আভ্যন্তরীণ দেশীয় রাষ্ট্রের আগ্রাসনের নয়া উপনিবেশের সূত্রপাত। ভারত যেমন স্থানীয় জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক রাজ্য/অঞ্চল কব্জা করে নিয়েছে, তেমনি পাকিস্তানও। উভয় নতুন রাষ্ট্রশক্তিই উপনিবেশিক শক্তির কায়দায় দ্রুত আগ্রাসী ভূমিকায় দুর্বল জাতিগুলিকে গ্রাস করে নিয়েছে। ভারত যেমন জম্মু-কাশ্মীর, নাগাল্যান্ড, তেমনি পাকিস্তানও বালটিস্তান, পার্বত্য চট্টগ্রাম তড়িঘড়ি দখলে নিয়ে যার যার সাম্রাজ্য পাকাপোক্ত করেছে।

ভারত স্বাধীনতা আইন লঙ্ঘন করে ৯৮% অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে আজ চরম দুর্দশার মধ্য দিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। দেশভাগের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতি অন্যায়ের কারণেই জুম্ম জনগণ নিজ দেশে পরবাসী এক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিণত হয়েছে একটি নয়া উপনিবেশে। গোড়া থেকেই ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তান পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি পুলিশ বাহিনী (ফ্রন্টিয়ার পুলিশ রেগুলেশন) বাতিল, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থাকে লঙ্ঘন করে ভারত থেকে আগত মুসলিমদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি প্রদান, ষাট দশকে কাপ্তাই বাঁধের মাধ্যমে লক্ষাধিক জুম্মদেরকে উচ্ছেদ, 'শাসন-বহির্ভুত এলাকা' ও 'ট্রাইবাল এরিয়া'র মর্যাদা পর্যায়ক্রমে তুলে দেয়া, জুম্ম জনগণের মতামত ব্যতিরেকে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রামে শাসনবিধি সংশোধনের মাধ্যমে জুম্ম জনগণের অধিকার হরণ করা ইত্যাদি একের পর জুম্ম বিধ্বংসী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। জাতিগত শোষন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে গৌরবময় রক্তাক্ত সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হলেও জুম্ম জনগণের উপর সেই জাতিগত নিপীড়ন বন্ধ হয়নি। বরঞ্চ আরো জোরদার হয়েছে। উপনিবেশিক কায়দায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের উপর চলছে শাসন-শোষণ। বাংলাদেশের শাসনামলেও জুম্ম জনগণের স্বায়ত্তশাসনের দাবি প্রত্যাখ্যান, জুম্ম জনগণের জাতীয় পরিচিতি ও স্বাতন্ত্র্যতাকে অস্বীকার করে সাংবিধানিকভাবে বাঙালি হিসেবে পরিচয় প্রদান, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে চার লক্ষাধিক বহিরাগত মুসলিম বসতি প্রদান, ভূমি বেদখল ও স্বভূমি উচ্ছেদ, নারী নির্যাতন, ধর্মান্তরিতকরণ, ব্যাপক সামরিকায়নের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদী কায়দায় দমন-পীড়ন, ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের গড়িমসি ইত্যাদির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব আজ বিলুপ্তির দাঁড় প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।

খুব বেশি দেরি নেই

হাফিজ রশিদ খান

খুব বেশি দেরি নেই প্রশান্ত প্রত্যাশাগুলো
আমাদের ঘিরে রবে
খুব লাল গোলাপ দিবসগুলো আমাদের উষ্ণ
করতলে এসে কথা কবে
সকলের দৃষ্টির ভেতর খুশির বাতাসা
লুটোপুটি খাবে অবিরাম
উদার উল্লাসে মানুষের খুব কাছে গিয়ে
মানুষেরা গান গাবে, প্রাণের আরাম
আমাদের উজ্জ্বল কন্যারা প্রজাপতিসম
রঙিন হাসির আশা নিয়ে ভালোবাসবে
সভ্যতা ও সত্যের বন্ধনকে
ঝিরি ও ঝরনা, নদী ও বৃক্ষের, সমতল আর
পাহাড়ের থামাবে বহুদিনের ক্রন্দনকে
যে-স্বপ্ন দেখেছি আমি আজ আর গতকাল
দেখেছিলেন মিস্টার এম এন লারমা তাঁর তিতিক্ষায়
অমন একটা দেশ
আমরা পাবোই পাবো
জাতীয় পতাকা হাতে সন্তানেরা আজ নেমেছে রাস্তায়...

১০/১০/২০২০

জয় হবে প্রগতির

সম্রাট সুর চাকমা

তুমি গিরি, তুমি দেবেন, তুমি পলাশ, তুমি প্রকাশ
জুম্ম জাতির কুলাঙ্গার তুমি;
তুমি নরপিশাচ।
'৭১-র সময়ে রূপে তুমি কাদের মোল্লা,
আরও রূপে দেলোয়ার হোসেন সাঈদী
বাঙালি জাতির কুলাঙ্গার তুমি;
স্বাধীন বাংলাদেশে তুমি কয়েদি।

তুমি জঙ্গলী, তুমি জানোয়ার, তুমি রক্তপিপাসু
জুম্ম জাতির ধ্বংসকারী তুমি;
'৮৩'র বীভৎস ঘটনা নয় কি কিছু?
ঠাঁই নেই তোমার কোথাও হবে না স্থান,
নিশ্চিহ্ন হবে তুমি;
ফাঁসির মঞ্চে রচিত হবে তোমার নাম।

তুমি বিদ্বেষী, তুমি ধর্ষণকারী, তুমি লোলুপতা
মায়ের ইজ্জত কেড়েছো তুমি;
তুমি কপট।
জেগেছে নারী হয়েছে প্রতিবাদী
দিন শেষে তুমি,
গণধোলাই হবে তোমার শাস্তি।

তুমি দালাল, তুমি সংস্কারবাদী, তুমি চুক্তিবিরোধী
জাতির বিপথগামী তুমি;
তুমি অপরাধী।
এখনো সময় আছে যাওগো জনতার সাথে মিশি
যদি না শোন তুমি,
জুম্ম জনতার মঞ্চে তোমারও হবে ফাঁসি।

তুমি প্রতিক্রিয়াশীল, তুমি রক্ষণশীল, তুমি পশ্চাৎপদ
কিসে অহংকার তোমার?
সব কার্যই তোমার মন্দ।
পরাজয় হবে তোমার, জয় হবে আমাদের
জয় হবে এম এন লারমার
জয় হবে আদর্শের
জয় হবে প্রগতির........।

সেদিন ভোর হতে পারেনি

শরৎ জ্যোতি চাকমা

সেদিন ১০ নভেম্বর ১৯৮৩, জুমজীবনে ভোর হতে পারেনি
এক ঝাঁক শকুন এই ভোরকে কলংকিত করেছে
অথচ আগত প্রভাতের রক্তিমাভায়
কান্ডারির তন্দ্রা ভেঙ্গে প্রেরণার প্রদীপ জ্বলতে পারতো।
প্রিয় গাদাফুলে শিশিরবিন্দু ভিজিয়ে দিতো শত বিপ্লবীর শরীর
রাঙা ভোরের প্রতিটি রশ্মি চেতনার হতে পারতো
ভোর আসেনি, ভোর হয়নি
এক ঝাঁক বেসুরা ঐক্যের প্রতিবিপ্লবী কথা রাখেনি।

সেদিন ১০ নভেম্বর ১৯৮৩,
নতুন ভোরে এম এন লারমার কথা শোনার কত প্রতীক্ষা
ক্ষমা গুণে মানব প্রেম, একতার বন্ধন
প্রকৃতির কত শিহরণ, হেমন্তের মৃদু বাতাসে সবুজ বৃক্ষের মিতালী
সবই একটি ভোরের প্রতীক্ষা, যা হতে পারতো আলোকিত সমাজের প্রতীক
একটি নব সভ্যতার নতুন কবিতা, লাখো শিশুর পাঠশালা
ভোর আসেনি, ভোর হয়নি
এক ঝাঁক বেসুরা ঐক্যের প্রতিবিপ্লবী কথা রাখেনি।

সে দিন ১০ নভেম্বর ১৯৮৩,
বিষাদময় এমন প্রভাতের কাম্য ছিল না।
সে দিন সূর্যের রাঙা রশ্মি নয়নে ঝাপসা মনে হওয়ার কথা ছিল না
ভোর হতে পারেনি বলে,
পক্ষীকূলের কাকলীতে অপূর্ণতার ছন্দ
অন্ধকার নামে জুমপাহাড়ের প্রতি প্রান্তে, সমীরণের ধাক্কায় বৃক্ষরাজির সংঘর্ষ
এম এন লারমার রক্তে ভিজে যায় তার প্রিয় জুমের মাটি
প্রিয় নেতার প্রাণহীণ দেহখানি পড়ে আছে সেটায়
পড়ে আছে আট সহযোদ্ধার নিথর দেহ
যেন এখনি উঠে দাঁড়িয়ে নেতাকে বলবে মেজর পরিমল
স্যার ও স্যার, ভোর হয়েছে, মুখে কিছু দাও, তোমার যে ঔষধ খেতে হবে!
কী নির্মম সে দিনের কলংকিত সকাল
শত বিপ্লবীর কান্না প্রতিশোধের
এম এন লারমার চেতনা অমর হোক
বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

সেদিন ১০ নভেম্বর ১৯৮৩
পাশের ঝর্ণাগুলোর জলপ্রবাহ সে দিন বেসুরা
ঝিরির চারিধারে ঘিরে রাখা বনের শতবর্ষী গর্জন গাছের কী কান্না
মৃদু সমীরণে অস্থির পুষ্পকানন
মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে শত শত হাসনাহেনা
ঘৃণা ভরা চোখে সে দিন জল আসে না জ্যোতিপ্রভার
অন্তহীণে দৃষ্টি দেয় সন্তু লারমা, শোক ক্ষোভে পরিণত হোক
এম এন লারমার স্বপ্ন বাঁচুক জুমের নিযুত পাহাড়ের ধারে
প্রতিটি বৃক্ষের ডালপালায় শিরায় উপশিরায়
ঐক্যবদ্ধ এক জুমের প্রাণপ্রদীপ, নব চেতনার কান্ডারী এগিয়ে যাক,
মুক্ত জুমে বয়ে চলুক বিশুদ্ধ সমীরণ
হিংসার ঝর্ণাধারায় পবিত্রতা আলিঙ্গন করুক
অমাবস্যার তিমিরতায় ভরা চন্দ্রের ঝিলিকে জুম আলোকময় হোক
আসুক আলোকিত ভোর
১০ নভেম্বর ১৯৮৩ অমর হোক
বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

১১ অক্টোবর ২০২০

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাধে চলছে জুম্মদেরকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিতকরণ

সাম্প্রতিক সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ, হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী আদিবাসী জুম্মদেরকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিতকরণের কার্যক্রম জোরদার হয়েছে। বিশেষ করে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, গৃহ নির্মাণ, গরুছাগল পালন, সুদমুক্ত ঋণ ইত্যাদি প্রলোভন দেখিয়ে বান্দরবান জেলায় ধর্মান্তরকরণ চলছে। বান্দরবান জেলায় 'উপজাতীয় মুসলিম আর্দশ সংঘ', 'উপজাতীয় মুসলিম কল্যাণ সংস্থা' ও 'উপজাতীয় আর্দশ সংঘ বাংলাদেশ' ইত্যাদি সংগঠনের নাম দিয়ে জনবসতিও গড়ে তোলা হয়েছে এবং এসব সংগঠনের মাধ্যমে জুম্মদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিতকরণের কাজ চালানো হচ্ছে। ধর্মান্তরিতকরণের এই প্রক্রিয়া স্থানীয়ভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় যেমন চলছে, তেমনি ভালো শিক্ষার প্রলোভন দেখিয়ে আদিবাসী জুম্ম শিশুদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে নিয়ে গিয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হচ্ছে।

লেখাপড়া শেখানোর লোভ দেখিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকে তাদের মাতা-পিতা থেকে নিয়ে ঢাকা, গাজীপুরসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় পিতা-মাতার অজান্তে মাদ্রাসায় ভর্তি করানো এবং ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার সংবাদ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গণমাধ্যমে উঠে এসেছে। অন্যদিকে জুম্ম নারীদেরকে ফুসলিয়ে কিংবা ভালবাসার প্রলোভন দেখিয়ে বিয়ে করা এবং ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার ঘটনা সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিয়ের কিছুদিন পর বিবাহিত জুম্ম নারীকে শারীরিক নির্যাতন করা এবং নানা অজুহাতে তাড়িয়ে দেয়ার ঘটনাও ঘটেছে। এমনকি বিবাহিত জুম্ম নারীর সাথে যৌন জীবনের ভিডিও ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতেও দেখা গেছে।

উল্লেখ্য, স্মরণাতীত কাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি অমুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল। চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, বম, খিয়াং, লুসাই, পাংখো, খুমী, চাক প্রভৃতি আদিবাসী জাতি স্মরণাতীত কাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করে আসছে, যারা বৌদ্ধ, হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী এবং সম্মিলিতভাবে নিজেদেরকে 'জুম্ম' (পাহাড়ি) নামে পরিচয় দেয়। ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধ, হিন্দু ও খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী এসব আদিবাসী জুম্ম জাতিসমূহের জনসংখ্যা ছিল ৯৭.৫%। আর ছিল মুসলিম বাঙালি জনসংখ্যা ১.৫% ও হিন্দু বাঙালি জনসংখ্যা ১.০%।

অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির পর পরই তৎকালীন পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার কার্যক্রম হাতে নেয়। তার মধ্যে অন্যতম হলো জুম্ম জনগণের রক্ষাকবচ হিসেবে বিদ্যমান ব্রিটিশ প্রবর্তিত আইন, বিধি ও বিধিব্যবস্থা বাতিল করা; আইন লঙ্ঘন করে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি প্রদান করা; উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের (ডেভেলাপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের) মাধ্যমে জুম্ম জনগণের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়া এবং তাদের চিরায়ত ভূমি ও বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করা; সর্বোপরি বৌদ্ধ, হিন্দু ও খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী আদিবাসী লোকগুলোকে ধীরে ধীরে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশের সরকারসমূহও অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার পাকিস্তানী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ অব্যাহত রাখে। যার অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত সরকারি অর্থায়নে সমতল অঞ্চলের চার লক্ষাধিক মুসলমান পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি প্রদান করা। সেই সাথে চলতে থাকে নানা প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে কিংবা হুমকি-ধামকি দিয়ে জুম্মদেরকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিতকরণের কার্যক্রম। ফলে যেখানে ১৯৪৭ সালে জুম্ম ও মুসলিমদের অনুপাত ছিল ৯৮ জন জুম্ম ২ জন মুসলিম, আজ ৭৩ বছর পর এই অনুপাত উল্টো হতে শুরু হয়েছে।

২০১৭ সালের জানুয়ারিতে ঢাকা ট্রিবিউন, ইউএনপিও, বুড্ডিস্টডোর.নেট, হেরাল্ডমালয়েশিয়া.কমসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে ও প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারি ২০১০ হতে জানুয়ারি ২০১৭ সালের মধ্যে সাত বছরে কেবল পুলিশ কর্তৃক ধর্মান্তরে জড়িত ইসলামী চক্রের হাত থেকে ৭২ জন আদিবাসী জুম্ম শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে। এর বাইরে যে আরও অনেক আদিবাসী পরিবার ও শিশু এ ধরনের অপরাধী চক্রের শিকার হয়েছেন তা সহজেই অনুমেয়। সাম্প্রতিককালে এই ধর্মান্তরিতকরণের তৎপরতা আরও ব্যাপকতা লাভ করেছে বলে জানা গেছে।

বিগত কয়েক বছরের মধ্যে, বিশেষত কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পরপরই বান্দরবান পার্বত্য জেলার আলিকদম উপজেলাসহ বিভিন্ন এলাকায় আদিবাসীদের এ ধরনের ধর্মান্তরিতকরণের ব্যাপক কার্যক্রমের খবর পাওয়া গেছে। যেখানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সম্মতি ও সহযোগিতা রয়েছে বলে স্বীকার করা হয়েছে।

আপাত দৃষ্টিতে এই ধর্মান্তরিতকরণ প্রক্রিয়াকে বিচ্ছিন্ন বা সাধারণ মনে হলেও নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করলে এটি একটি পরিকল্পিত ও সুসমন্বিত কার্যক্রমের অংশ বলে প্রতীয়মান। এই কার্যক্রমে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর যে প্রত্যক্ষ হাত রয়েছে তা বলাই বাহুল্য। আর বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যে এই প্রক্রিয়াকে নিবিড়ভাবে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে তাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অপরদিকে ক্ষমতাসীন সরকারি দলের জুম্ম সম্প্রদায়ের স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্তৃপক্ষের চোখের সামনেই এসব নির্বিঘ্নে ঘটে চলেছে। অবশ্য আদিবাসীদের ধর্মান্তরকরণ ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে সহযোগিতা ও মদদদানের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের সম্পৃক্ততা এর পূর্বেও বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে।

১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর ইসলাম ধর্মে দীক্ষিতকরণের কাজ কিছুটা ভাটা পড়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ ২৩ বছরেও পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায়, বিশেষ করে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরকারী শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকারের একনাগাড়ে দীর্ঘ ১২ বছর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকার পরও পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়িতত না হওয়ায় প্রশাসনের ছত্রছায়ায় মৌলবাদী গোষ্ঠী কর্তৃক জুম্মদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরকরণের কাজ বর্তমানে চাঙ্গা হয়েছে। নিম্নে এর কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো–

শিক্ষার সুযোগ দানের ফাঁদ পেতে মাদ্রাসায় ভর্তি ও ইসলামে ধর্মান্তরিতকরণ

দেশের কিছু প্রত্যন্ত আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার শিশুদের জোরপূর্বকভাবে তাদের স্ব স্ব ধর্ম থেকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে। এসমস্ত পরিবারসমূহ আর্থিক অস্বচ্ছলতা ও তাদের এলাকা থেকে স্কুলের দুর্গম্যতার কারণে তাদের শিশুদের স্কুলে পাঠাতে না পারায়, দরিদ্র ও নিরক্ষর আদিবাসী পরিবারের শিশুরা এরূপ ধর্মান্তরকরণের প্রধান শিকার। এই অমুসলিম আদিবাসী সম্প্রদায়কে ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্যে ধর্মীয় মৌলবাদীরা সারা দেশকে 'ইসলামীকরণ'-এর উদ্দেশ্য নিয়ে গোপনে কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগোষ্ঠীকে প্রলুব্ধ করার জন্য শিক্ষাকে ব্যবহার করছে।

জানা গেছে, ইসলাম ধর্মীয় মৌলবাদীরা তারা ভালো স্কুলে শিক্ষার ব্যবস্থা করবে এই প্রলোভন দেখিয়ে এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কথাবলে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল আদিবাসী পরিবারগুলোকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু বাস্তবে এইসব ধর্মীয় মৌলবাদীরা আদিবাসী শিশুদের কখনোই ভালো স্কুলে নিয়ে যায় না, বরং ইসলামে ধর্মান্তরিত করার অভিসন্ধি নিয়ে তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসায় নিয়ে যায়। সেখানে সেই শিশুদের ধীরে ধীরে নিজের পরিবার, সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে ইসলামী ধর্ম ও সংস্কৃতি শিখতে ও গ্রহণ করতে বাধ্য করে।

গত ১ জানুয়ারি ২০১৭, ঢাকায় এক মাদ্রাসায় পাচার হওয়ার সময়, পুলিশ বান্দরবান শহরের 'অতিথি আবাসিক হোটেল' থেকে চার আদিবাসী শিশুকে উদ্ধার করে। ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তিরিত আবু বক্কর সিদ্দিক (৪৫), যার পূর্ব নাম মংশৈ প্রু চৌধুরী ও মোহাম্মদ হাসান (২৫) এই পাচারকাজের অন্যতম মূল হোতা বলে জানা যায়। তাদেরকে উক্ত চারজন শিশুসহ হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়। অপরদিকে তাদের সঙ্গী সুমন খেয়াং গ্রেফতার থেকে পালিয়ে যায়। গ্রেফতারের পর বান্দরবান সদর থানায় একটি মানবপাচার মামলা দায়ের করা হয়। উদ্ধারকৃত শিশুরা সকলেই বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাছা ইউনিয়নের বাসিন্দা। অপরাধ চক্রের সদস্যদের কর্তৃক শিশুদের পরিবারগুলোকে ঢাকায় বিনা খরচে তাদের শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার প্রলোভন দেখানো হয়।

কাপেং ফাউন্ডেশন ২০১৭ সালের তার বার্ষিক মানবাধিকার প্রতিবেদনের পূর্ববর্তী সংখ্যায় আদিবাসী শিশুদের জোরপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণের এরকম কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরে। তার পূর্ববর্তী ৭ বছরে অন্তত ৭০ জন আদিবাসী শিশু, অধিকাংশই খ্রীষ্টিয় ও হিন্দু ধর্মের সাথে যুক্ত, তাদেরকে দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে পুলিশ কর্তৃক উদ্ধার করা হয়। এসব শিশুদের অধিকাংশই বান্দরবান জেলা থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল।

এর পূর্বে ২ জানুয়ারি ২০১৩, পুলিশ ঢাকার সবুজবাগ থানাধীন আবুযোর জিফারি মসজিদ কমপ্লেক্স নামের এক মাদ্রাসা থেকে ১৬ আদিবাসী শিশুকে উদ্ধার করে। শিশুদের জোর করে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়। ত্রিপুরা ও চাকমা জাতিভুক্ত এসব শিশুদের পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতারণা করে নিয়ে যাওয়া হয়। এছাড়া ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ আদিবাসী ত্রিপুরা শিশুদের আরেকটি গ্রুপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফোরামের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক ঢাকা থেকে উদ্ধার করা হয়। শিশুদেরকে বান্দরবানের চিম্বুক এলাকা থেকে ফিরোজপুর জেলার একটি মাদ্রাসায় নেয়া হচ্ছিল। তাদেরকে একটি মিশনারী স্কুলে ভর্তি করানো হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল।

এর আগে ২০১২ সালের জুলাই মাসেও গাজীপুর ও ঢাকার বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে ১১ জন আদিবাসী ত্রিপুরা শিশুকে উদ্ধার করা হয়। তাদের মধ্যে গাজীপুর জেলার মিয়া পাড়ার দারুল হুদা ইসলামী মাদ্রাসা থেকে ৮ শিশুকে এবং ঢাকার মোহাম্মদপুরের এক মাদ্রাসা থেকে ১ নারী শিশু ও গুলশানের দারুল হুদা মাদ্রাসা থেকে ২ শিশুকে উদ্ধার করা হয়।

২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে পুলিশ কর্তৃক কেবল বান্দরবান শহরের এক মোটেল 'অতিথি বোর্ডিং' থেকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ৩৩ শিশুকে উদ্ধার করে। বান্দরবানের থানচি উপজেলা থেকে এই শিশুদের সংগ্রহ করে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ধানমন্ডী আদর্শ মদিনা স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হবে এই প্রতিশ্রুতি ও প্রলোভন দেখিয়ে। এসময় পুলিশ গর্ডন ত্রিপুরা ওরফে রুবেল, ঢাকার দারুল ইহসান মাদ্রাসার ছাত্র আবু হোরাইরা ও শ্যামলীর বাসিন্দা আবদুল গণি নামের শিশুদের পাচারকারী তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে।

অন্যদিকে লাদেন গ্রুপ নামে খ্যাত মুহাম্মদিয়া জামিয়া শরিফা লামা উপজেলায় দখল করেছে ৭ হাজার একর পাহাড় ভূমি। লাদেন গ্রুপের কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হলো আদিবাসীদের বসতভিটা ও জুমভূমি জবরদখল করা, বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে অর্থ দিয়ে আদিবাসী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও খ্রিষ্টানদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা এবং ঢাকায় উন্নত ও উচ্চ শিক্ষার প্রলোভন দিয়ে আদিবাসী শিশু-কিশোরদের কৌশলে ঢাকায় নেয়া।

অপরদিকে বান্দরবান জেলার লামা উপজেলায় 'কোয়ান্টাম ফাউন্টেশন' নামে জাতীয় পর্যায়ের একটি এনজিও কর্তৃক ২০০১ সাল প্রতিষ্ঠিত কোয়ান্টাম স্কুল ও কলেজে নানা প্রলোভন দেখিয়ে জুম্ম ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করা হয়। কোয়ান্টাম আবাসিক স্কুলে জুম্ম ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষায় কথা বলতে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়ে থাকে। ফলে মাতৃভাষায় কথা বলার সুযোগের অভাবের কারণে জুম্ম শিশুরা মাতৃভাষা ভুলে যেতে থাকে। বিশেষ করে কোয়ান্টামে ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুরক্ত ও সেই ধর্মীয় সংস্কৃতিতে জুম্ম ছাত্রছাত্রীদের গড়ে তোলার অভিযোগ রয়েছে। উক্ত কলেজে জুম্ম ছাত্রছাত্রীদেরকে সরাসরি ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিতকরণে উদ্বুদ্ধ না হলেও ইসলামী আদব-কায়দা ও জীবনাচারে গড়ে তোলা হয়। তাদেরকে শ্রেণিকক্ষে 'সালামালিকুম', 'ওলাইকুম সালাম' ইত্যাদি ইসলামী সম্বোধন ব্যবহার করতে বাধ্য করা হয়। নামাজ কিভাবে আদায় করতে হয় তা শেখানো হয়।

উপজাতীয় মুসলিম আর্দশ সংঘ ও তাবলীগ জামায়াত কর্তৃক আলিকদম ও লামায় ধর্মান্তরকরণ

বান্দরবান জেলার আলিকদম উপজেলা থানচি সড়ক ১১ কিমি এলাকায় ১ জানুয়ারি ২০১৮ সালে ১৪টি অসহায় ও গরিব পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা দেওয়ার নাম করে তাদের মাঝে সুদ মুক্ত ঋণ, তাদের মাঝে গৃহপালিত গরু-ছাগল দেওয়া হবে, তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ করে দেওয়া সহ নানা ধরনের প্রলোভন দেখিয়ে দরিদ্র পাহাড়িদের মন ভুলিয়ে সুযোগ বুঝে গোপনে উপজাতীয় মুসলিম আর্দশ সংঘ ও দাওয়াতে তাবলীগের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করছে।

গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, ঈদগাঁও মডেল হাসপাতাল এন্ড ডায়াবেটিস কেয়ার সেন্টারের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডা: মো: ইউসুফ আলী মানবকল্যাণ কাজ তথা অসহায়, গরীব, দুঃস্থ রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবাসহ নানান মানব সেবামূলক কাজকর্মের মাধ্যমে স্থানীয় গরিব পাহাড়িদের সম্পর্ক গড়ে তোলে। তেমনি তার হাসপাতালে চিকিৎসা করতে আসা উপজাতীয় মুসলিমদের সাথে পরিচয় ঘটে। তাদের সমস্যার কথা জেনে এ পরিবারগুলোর সন্তানদের লেখাপড়ার সুব্যবস্থা করে। বর্তমানে বিভিন্ন মাদ্রাসায় ১৯ জনের মত জুম্ম ছেলেমেয়ে মুসলিম রয়েছে। অনেকে ঈদগাঁও'র বিভিন্ন মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া শেষ করছে।

কয়েকজন উপজাতীয় মুসলিমদের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে তাদেরকে বিভিন্নভাবে আর্থিক সহযোগিতা ও সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে; গরু-ছাগল, নগদ অর্থ, গৃহ নির্মাণ করে দেওয়াসহ সুদ ঋণ দেওয়া হবে ইত্যাদি প্রলোভন দেখানো হয়। খ্রীষ্টান ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া আবু বক্কর ছিদ্দিক (যার পূর্বের নাম অতিরম ত্রিপুরা) বলেন, কোর্টে গিয়ে এফিডেভিট মূলে ধর্ম ও নাম পরিবর্তন করে মুসলিম হতে হয়। তিনি আরো বলেন, বর্তমানে তার ছেলে সাইফুল ইসলাম (পূর্বের নাম রাফেল ত্রিপুরা) ডা: ইউসূফ আলী হাসপাতালে চাকরিরত আছে।

তিনি বলেন, বাইবেলে লেখা আছে যে তোমরা সত্যকে খোঁজ, সত্য তোমাদের মুক্ত করবে। সে সত্যকে খুঁজতে গিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন বলে তিনি জানান। তার মা, বাবা, ভাইসহ সবাই মুসলিম হয়েছে। অন্যদিকে আলিকদমের জেসমিন আক্তার (পূর্বের নাম ঝর্ণা ত্রিপুরা), রোয়াংছড়ির সাদেকুল ইসলাম (জয়খর্ন ত্রিপুরা), গয়ালমারার নুরুল ইসলাম (প্রশান্ত ত্রিপুরা) সবাই এফিডেভিট মূলে ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করেছেন বলে জানান।

এদিকে লামা উপজেলার গয়ালমারা গ্রামে বসাবসরত ত্রিপুরাদের উপজাতীয় মুসলিম কল্যাণ সংস্থা ও উপজাতীয় আর্দশ সংঘ বাংলাদেশ, তাবলিগ ও জামায়াত-এর আলেম হাফেজ মো: জহিরুল ইসলাম, হাফেজ মো: কামাল, মো: মোহাম্মদুল্লাহ, হাফেজ মো: সালামাতুল্লাহ, মৌলভী হেলাল উদ্দিন ত্রিপুরা এবং সাইফুল ইসলাম ত্রিপুরা সভাপতি উপজাতীয় নুও মুসলিম আর্দশ সংঘ তাদের নেতৃত্বে গয়ালমারা

৪৫টি পরিবারকে আর্থিক ও নানা ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে।

অন্যদিকে আলিকদমের জেসমিন আক্তার পূর্বের নাম ঝর্ণা ত্রিপুরা, রোয়াংছড়ির সাদেকুল ইসলাম পূর্বের নাম জয়খর্ন ত্রিপুরা, গয়ালমারায় নুরুল ইসলাম পূর্বের নাম প্রশান্ত ত্রিপুরা সবাই ইসলামী ধর্মান্তরকরণের শিকার হয়েছেন। আলিকদম-থানচি ১১ কিলো এলাকাসহ মোট ৪৫ পরিবার ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছেন।

সরেজমিন তদন্তে জানা যায় যে, বান্দরবান পৌর এলাকার বাস স্টেশনে ১৯৯৯ সালের দিকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত ত্রিপুরা ও খিয়াং রয়েছে ৩০-এর অধিক পরিবার এবং টাংকি পাড়ায় ২০০১ সাল থেকে বসবাস রয়েছে নুও ত্রিপুরা মুসলিমদের ১৫-এর অধিক পরিবার।

লামা উপজেলার লাইনঝিড়িতে ১৯৯৫ সাল থেকে ত্রিপুরা মুসলিমদের ১৭-এর অধিক পরিবার ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। গত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে মোঃ রাসেল ত্রিপুরা (পূর্বের নাম রামন্দ্র ত্রিপুরা)-এর স্ত্রী সারেবান তাহুরা ত্রিপুরা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিল। আলিকদম-থানচি সড়কের ক্রাউডং (ডিম পাহাড়) এলাকায় (রূপসী ইউনিয়ন) ২০০০ সাল থেকে ত্রিপুরা মুসলিমদের রয়েছে ১৬ পরিবারের মতো।

বান্দরবান কি ধর্মান্তরকারীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে?

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলাই ইসলামী মৌলবাদী ধর্মান্তরকারী গোষ্ঠীর টার্গেট ও কর্মক্ষেত্র হলেও, সাম্প্রতিককালে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ইসলামী গোষ্ঠী কর্তৃক দরিদ্র আদিবাসী জুম্মদের ইসলামে ধর্মান্তরিতকরণ তৎপরতা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মনে হয়, বান্দরবান যেন এখন ইসলামে ধর্মান্তরিতকরণের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। একটি সূত্রের মতে, বান্দরবান পৌরসভা, আলিকদম, রোয়াংছড়ি, লামাসহ বিভিন্ন এলাকায় ১০টির অধিক জুম্ম মুসলিম পাড়া বা বসতি রয়েছে। এইসব ধর্মান্তরিত জুম্ম মুসলিমদের বলা হচ্ছে 'নও মুসলিম' বা 'উপজাতি মুসলিম'। এই ধর্মান্তরিত মুসলিম বসতিগুলোকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে এবং কিছু বাছাইকৃত নও মুসলিমকে সুবিধা দিয়ে তাদের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত ধর্মান্তরের কার্যক্রম সম্প্রসারণের চেষ্টা চলছে।

বান্দরবানের আলিকদম উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা একে এম আইয়ুব খান, ডা: ইউসুফ আলী, হাফেজ মাওলানা সালামাতুল্লাহ, আলিকদম সদরের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ফরিদ আহম্মদ, আলিকদম উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আবুলকালাম, মোঃ জাহিদ, সাহাব উদ্দিন, মাওলানা ইমরান হাবিবি, মোহাম্মদ আইয়ুব প্রমুখ এই প্রক্রিয়ায় সক্রিয় রয়েছে বলে অভিযোগ ও বিভিন্ন প্রমাণ পাওয়া গেছে।

অপরদিকে আদিবাসী থেকে ধর্মান্তরিত যেসব নও মুসলিম এসব ধর্মান্তরকরণের সাথে জড়িত তাদের মধ্যে যাদের পরিচয় পাওয়া গেছে, তারা হল– জনৈক চাকমা ধর্মান্তরিত মুসলিম মোঃ শহিদ, উপজাতীয় মুসলিম আদর্শ সংঘের সহ-সভাপতি মৌলভী হেলাল উদ্দিন ত্রিপুরা, উপজাতীয় মুসলিম আদর্শ সংঘের সম্পাদক ধর্মান্তরিত মুসলিম ইব্রাহিম ত্রিপুরা, মুসলিম পাড়া মডেল একাডেমির শিক্ষক ধর্মান্তরিত মুসলিম সাইফুল ইসলাম ত্রিপুরা, আবু বক্কর ছিদ্দিক (পূর্ব নাম অতিরম ত্রিপুরা), খাগড়াছড়ির মোঃ আব্দুর রহিম (পূর্ব নাম ভিনসেন্ট চাকমা), মোঃ আব্দুর রহমান (পূর্ব নাম ভন্দ চাকমা), মোঃ ইব্রাহিম (পূর্ব নাম ভবাৎ চাকমা) প্রমুখ।

সম্প্রতি বান্দরবানের আলিকদমের এক টিলায় কলাবাগানের মধ্যে শিশু ও নারীসহ কয়েকজন সাধারণ জুম্মকে মোনাজাতের প্রশিক্ষণের ভিডিও প্রচারিত হয়। ভিডিওটিতে আলিকদম উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা একে এম আইয়ুব খান কর্তৃক মোনাজাত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করতে দেখা যায়। এতে এসময় ৩ জন শিশু, বিভিন্ন বয়সের ৪ জন নারী, ১০/১১ জন বিভিন্ন বয়সের আদিবাসী পুরুষকে মোনাজাতের প্রশিক্ষণ দিতে দেখা যায়। মোনাজাতে বেশ কয়েকজন মুসলিম বাঙালিও অংশগ্রহণ করেন।

আলিকদম উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা একে এম আইয়ুব খান কর্তৃক ধারনকৃত ও প্রচারিত আরেক ভিডিওতে জানা গেছে, ইতোমধ্যে আলিকদম উপজেলার থানচি সড়ক সংলগ্ন ১১ কিলোমিটার নামক এলাকায় ধর্মান্তরিত মুসলিমদের নিয়ে 'ইসলামপুর' নামে একটি পল্লী গড়ে তোলা হয়েছে। স্থাপন করা হয়েছে 'মুসলিম পাড়া মডেল একাডেমি'। এই ধর্মান্তরিত মুসলিমরা যাতে নিজেদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ভুলে গিয়ে গোঁড়া মুসলিম হিসেবে গড়ে উঠতে পারে সেই উদ্দেশ্যে সেখানে গড়ে তোলা হয়েছে মসজিদ ও মাদ্রাসা।

'উপজাতীয় মুসলিম আদর্শ সংঘ, বাংলাদেশ' নামে সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে। এমনকি এই ধর্মান্তরিত আদিবাসী মুসলিম পরিবারের তরুণীদের সরাসরি মুসলিম ছেলেদের সাথে বিয়ে দেয়ার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। ১১ কিলো এলাকায় অন্তত ৪৫ পরিবার আদিবাসী ধর্মান্তরিত মুসলিম রয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্র অনুযায়ী, মাত্র মাস দুয়েক আগে বান্দরবানের রোয়াংছড়ি উপজেলার আলেক্ষ্যং ইউনিয়নের ছাংলাওয়া পাড়ায় (শীলবান্ধা পাড়া) ৫ মারমা পরিবারকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। সেই ধর্মান্তরিত পরিবারগুলি হল– ১. অংঙৈসিং মারমা (পরিবারের সদস্য ৫ জন); ২. খ্যাইসাথুই মারমা (পরিবার সদস্য ৪জন); ৩. রেগ্যচিং মারমা (পরিবারের সদস্য ৬ জন); ৪. সিংনুমং মারমা (পরিবারের সদস্য ৫ জন), সাবেক মেম্বর, তার এক মেয়ে ১০-১৫ বছর আগে এক মুসলিম ছেলেকে বিয়ে করে; ৫. লোইসাংমং মারমা (পরিবারের সদস্য ৭ জন)।

জানা গেছে, এরা কেউই জেনে-বুঝে বা আগ্রহী হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। তাদের আর্থিক দুর্বলতার সুযোগে সুকৌশলে তাদেরকে মুসলমান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রেগ্যচিং মারমা ও অংঙৈচিং মারমার দুই সন্তানকে ভালো ভবিষ্যতের প্রলোভন দেখিয়ে মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে বিনিময়ে তাদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। জানা গেছে, সোলার প্যানেল দেওয়ার নাম করে তাদের কাছ থেকে আইডি কার্ড সংগ্রহ করা হয় এবং এরপর তাদেরকে মুসলমান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্রধান হোতা ডাঃ ইউসুফ আলী ও মাওলানা একে এম আইয়ুব খান?

স্থানীয় সূত্র ও বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে, আলিকদমসহ বান্দরবানে আদিবাসী জুম্মদের ইসলামে ধর্মান্তরিতকরণের সাথে সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে সক্রিয় ও তৎপর হিসেবে দেখা গেছে ডা: ইউসুফ আলী নামে এক বহিরাগত চিকিৎসক ও আলিকদম উপজেলা জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা একে এম আইয়ুব খানকে। তারা আদিবাসীদের অভাব-অনটনের সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে প্রতিনিয়ত আদিবাসীদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন এবং গরীব-অশিক্ষিত আদিবাসীদের ধর্মান্তরের জন্য এফিড্যাভিটসহ আইনি ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ডা: ইউসুফ আলীর গ্রামের বাড়ি বগুড়ায়, তবে বর্তমানে কক্সবাজারে থাকেন। সেখানে ঈদগাহ মডেল হসপিটাল ও ডায়াবেটিস কেয়ার সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আবাসিক সার্জন হিসেবে দায়িত্বে আছেন। জানা গেছে, তিনি অত্যন্ত সুক্ষভাবে ও সুকৌশলে বান্দরবানের আলিকদমসহ বিভিন্ন এলাকায় যেখানে সুযোগ পাচ্ছেন সেখানে আদিবাসী জুম্মদের ধর্মান্তরিতকরণে সক্রিয়ভাবে সাহায্য-সহযোগিতা, বুদ্ধি-পরামর্শ ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছেন। অপরদিকে, তিনি যেহেতু নিজে একজন চিকিৎসক এবং আর্থিকভাবে সমর্থ, সেকারণে অনেক সময় বিনা পয়সায় চিকিৎসার নামে অথবা কিছু আর্থিক সহযোগিতার নামেও আদিবাসীদের ধর্মান্তরিতকরণ করছেন।

ডা: মং এ নু চাক-এর সাথে ক্যামেরায় ছবি তুলে তিনি গত ৩ জুন তার এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে লেখেন, We hate racism but believe in brotherhood (অর্থাৎ, আমরা বর্ণবাদ ঘৃণা করি, তবে ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করি)। কিন্তু তিনি যে গরীব আদিবাসীদের সরলতা, দারিদ্র ও শিক্ষার অভাবের সুযোগ নিয়ে তাদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করার মধ্য দিয়ে মুসলিম বাঙালি বর্ণবাদ চাপিয়ে দিচ্ছেন এবং তাদের স্বকীয় সংস্কৃতির ধ্বংস করে চলেছেন সেই বোধ কি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন? মধুর কথার ফুলঝুরিতে, মানব সেবার আড়ালে তিনি কি এই আধুনিক যুগেও মধ্যযুগীয় কায়দায় অত্যন্ত অমানবিক ও ঘৃণ্য কাজ করছেন না?

গত ২৮ মে ২০২০ তিনি তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে লেখেন, 'আমাদের এক প্রিয় নও মুসলিমা পারভীন ত্রিপুরা। মানিকগঞ্জের এক মহিলা মাদ্রাসায় পড়ত। মা ও বর্তমান বাবা নও মুসলিম। সে মাদ্রাসায় পড়ালেখার কারণে তার তাকওয়া ছিল প্রশংসনীয়। বাবা-মা মুসলিম হলেও ইসলামি সংস্কৃতির চেয়ে ত্রিপুরা সংস্কৃতিকে প্রাধান্য বেশি দেয়। তাকে একবার ছুটিতে এনে আর মাদ্রাসায় যেতে দেয় না। সে যেন বাইরে যেতে না পারে এজন্য তার বোরখাটা পুড়ে ফেলে বাবা। তাকে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালায়। সে শর্ত দেয় পাত্রকে হাফেজ ও আলেম হতে হবে। কিন্তু তারা এক ছেলের সাথে তার অমতে বিয়ে ঠিক করে। সে বুঝতে পারে তার ইসলামের উপর চলা বন্ধ হয়ে যাবে। তখন সেতার বান্ধবীর সাথে কথা বলে রাখে। ফজরের আগে উঠে বান্ধবীর বোরখা নিয়ে পালায়। রাতে খবর পাই সে মাদ্রাসায় গিয়ে পৌঁছেছে। আমরা আশ্বস্ত হই। সে আর বাড়িতে আসে না।'

ডা: ইউসুফ আলী পরে এই পারভীন ত্রিপুরার সাথেই কক্সবাজারের ঈদগাহ কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওলানা সালামাতুল্লাহ'র বিয়ের ব্যবস্থা করেন।

পারভিন ত্রিপুরার বিষয়ে ফেসবুকের কথোপকথনে জনৈক Hillary Try Mhvc মন্তব্য কলামে লেখেন, 'দোয়া ত করি ৩/৫ বছর পর মেয়াদ শেষ হলে বাপের বাড়ি দরজায় সামনে

আসবেন না পারভিন বেগম ত্রিপুরা আপা'। এর জবাবে, ডাঃ ইউসুফ আলী লেখেন, 'কেন, অবশ্যই যাবে, শুদ্ধিকরণ মিশন নিয়ে যাবে। অলরেডি তার ছোটভাই কুরআন হিফজ শুরু করেছে।' এখানে ডা: ইউসুফ আলী 'শুদ্ধিকরণ মিশন নিয়ে যাবে' বলে কী বোঝাতে চেয়েছেন? এটা কি এই সমস্ত পারভিন বেগম ত্রিপুরা বা চাকমা-মারমা ধর্মান্তরিত মুসলিমদের দিয়ে বেধর্মী বা অশুদ্ধ আদিবাসীদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার মধ্য দিয়েই তিনি তথাকথিত শুদ্ধিকরণ মিশন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেননি?

ডা: ইউসুফ আলী তার ১৩ মে ২০২০ তারিখে ছবিসহ এক ফেসবুক পোস্টে লেখেন, 'ডানের বাচ্চা সাইমুনা ত্রিপুরা, পিতা-ওমর ফারুক ত্রিপুরা; বামের বাচ্চা আয়েশা ম্রো, পিতা-ইব্রাহিম ম্রো; মাঝখানে আমি বাঙালি। অনেক পার্থক্য, দুটি বড় মিল। প্রথম মিল আমরা মানুষ আর দ্বিতীয় মিল আমরা মুসলিম।' বাচ্চা দুটিকে তিনি দুপাশে দুটি রেখে ছবি উঠেন। বাচ্চাগুলো এখনও অবুঝ, দেড়-দুই বছরের বেশি হবে না।

ডা: ইউসুফ আলীর অন্যতম সহচর হচ্ছেন মাওলানা একে এম আইয়ুব খান, যিনি আলিকদম উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদের ইমাম। জানা যায়, তিনি আলিকদমের ১১ মাইল এর ধর্মান্তরিত মুসলিমদের যাবতীয় বিষয় দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধানসহ বান্দরবানের আদিবাসীদের ইসলামে ধর্মান্তরিতকরণের ক্ষেত্রে অন্যতম সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করে থাকেন। এই ধর্মান্তরকরণের প্রচার ও প্রসার কাজেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

সম্প্রতি বান্দরবানের আলিকদমের এক টিলায় কলাবাগানের মধ্যে শিশু ও নারীসহ কয়েকজন সাধারণ জুম্মকে মোনাজাতের প্রশিক্ষণ ও দীক্ষা অনুষ্ঠানের ভিডিও প্রচারিত হয়। এতে ৩ জন শিশু, বিভিন্ন বয়সের ৪ জন নারী, ১০/১১ জন বিভিন্ন বয়সের আদিবাসী পুরুষকে দেখা যায়। এসময় বেশ কয়েকজন মুসলিম বাঙালিও অংশগ্রহণ করেন। এই মোনাজাত প্রশিক্ষণ ও দীক্ষা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মাওলানা একে এম আইয়ুব খান।

জানুয়ারি ২০১৯ এর দিকে ধারণকৃত এবং পরে ইউটিউবে প্রচারিত এক ভিডিওতে মাওলানা একে এম আইয়ুব খান বলেন, '... সম্মানিত দ্বীনী ভাইয়েরা, আপনারা যারা এই ভিডিওটি দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা খুব খেয়াল করেন। কিছুদিন আগেও আমরা একটা ভিডিও দিয়েছিলাম। আমার আইয়ুব খান এই পেইজে। নও মুসলিমদের বান্দরবান উপজেলার আলিকদমের থানচি সড়কে আরকি, থানচি সড়কে এগারো কিলোতে কিছু আমাদের ভাইয়েরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাদের কিছু বাচ্চা, প্রায় ১৭-১৮ জন ছেলেদেরকে পড়ানো হচ্ছে মাদ্রাসায়। তাদের জন্য আমাদের এক দ্বিনী ভাই তার আব্বারই ইচ্ছার সোয়াবের জন্য এই যে আমাদের নও মুসলিম ভাইদের জন্য একটা মসজিদ আমরা নির্মাণ করেছি। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই মসজিদটি...'

তিনি আর বলেন, 'যদি কেউ কিছু করতে চান, আপনারা সরাসরি এসে করতে পারেন। এখানে কোন ধরনের অসুবিধা হবে না। আমরা এখানে সেনাবাহিনীদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছি এবং উনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেন।'

লক্ষ্য যখন জুম্ম নারী

জুম্মদের ধর্মান্তরিত করার এবং আধিপত্য বিস্তার ও জাতিগত নির্মূলীকরণের অন্যতম পন্থা হিসেবে লক্ষ্যভুক্ত করা হয় আদিবাসী নারীকে। ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, অপহরণ, যৌন হয়রানি ইত্যাদি সহিংসতা ছাড়াও জুম্ম সমাজকে আঘাত করার অন্যতম উপায় হিসেবে বেছে নেয়া হয় তথাকথিত ভালোবাসা বা ছলনার ফাঁদে ফেলে জুম্ম নারীদের করায়ত্ত করা। আর জুম্ম নারীকে বিয়ে করা বা ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়া মানেই হচ্ছে তাকে সহজে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা।

এই সহিংসতা বা বিয়ে করে ধর্মান্তরিত করা– সবকিছুতেই সরকার বা প্রশাসন তথা রাষ্ট্রের উদাসীনতা, আশ্রয়-প্রশ্রয়, মদদ ও পৃষ্ঠপোষকতা থাকে। যে কারণে চুক্তির পূর্বে ও পরে শত শত জুম্ম নারী ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যাসহ নানা সহিংসতার শিকার হলেও কোন ঘটনারই যথাযথ ও দৃষ্টান্তমূলক বিচার পাওয়া যায়নি। সাম্প্রতিক কালে ধর্ষণের অভিযুক্তদের কাউকে কাউকে গ্রেফতার করা হলেও শেষ পর্যন্ত তারা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পায় না।

সম্প্রতি সহিংসতার পাশাপাশি, বাঙালি মুসলিমদের কর্তৃক ভালোবাসা বা ছলনার ফাঁদে ফেলে জুম্ম নারীদের বিয়ে করে ধর্মান্তরিত করা বা সমাজ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা, যাকে বলা হচ্ছে 'লাভ জিহাদ', সেটা অনেক বৃদ্ধি পাওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। এতে অনেক জুম্ম নারী চরম প্রতারণার শিকার হচ্ছে এবং বিপদগ্রস্ত হচ্ছে।

অতি সম্প্রতি এমন প্রতারক ও বিকৃত রুচিসম্পন্ন এক মুসলিম যুবকের প্রতারণা তথাকথিত লাভ জিহাদের শিকার হয় আদিবাসী ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের এক শিক্ষিত নারী। ঐ মুসলিম যুবক প্রেমের অভিনয় করে উক্ত ত্রিপুরা নারীর সাথে শারীরিক সম্পর্কও গড়ে তোলে এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সেসবের ভিডিও ফুটেজ ধারণ করে। এক পর্যায়ে মুসলিম যুবকটি ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে মেয়েটিকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করে পরিবার ও সমাজের অমতে বিয়েও করে। পরে ঐ যুবক ত্রিপুরা মেয়েটিকে বিভিন্ন অসামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত করার চেষ্টা

করে। এসময় মেয়েটি ছেলেটির ভয়ংকর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তার কাছ থেকে সরে আসার প্রচেষ্টা চালায়। আর এসময় মুসলিম যুবকটি তাদের শারীরিক সম্পর্কের ভিডিও ফুটেজ সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করে। ফলে মেয়েটি পারিবারিক ও সামাজিকভাবেগভীর সংকটের মধ্যে পড়ে।

উল্লেখ্য যে, এ পর্যন্ত বহু আদিবাসী জুম্ম নারী এধরনের প্রতারণা বা লাভ জিহাদের শিকার হয়ে তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিপর্যয়ের শিকার হয়েছেন। বস্তুত আদিবাসীদের প্রতি সহিংস দৃষ্টিভঙ্গি ও আদিবাসী নারীদের প্রতি পাশবিক লালসা থেকেই এই ধরনের চিন্তা ও ঘটনার জন্ম।

ধর্মান্তরিতকরণ কি জাতিগত নির্মূলীকরণেরই অংশ!

বাংলাদেশের সংবিধানে 'ইসলাম'কে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। অপরদিকে সংবিধানে, 'হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমান মর্যাদা ও সমান অধিকার নিশ্চিত করবে' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০১১ সালের শুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে মাত্র ৮.৫% ভাগ হিন্দু এবং মাত্র ১% ভাগ বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য ধর্মের লোক রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের ইসলাম যেন এই স্বল্প সংখ্যক ভিন্নধর্মী আদিবাসীদের অস্তিত্বও ধ্বংস করতে তৎপর হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামকে আদিবাসী জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করে ইসলামীকরণ করা এবং পার্বত্যাঞ্চল থেকে জুম্মদের জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের অন্যতম অংশ হিসেবে এই ধর্মান্তরিতকরণ চলছে বলে অনেক আদিবাসী জুম্মর অভিযোগ। এমনকি আরাকান, কক্সবাজার ও তিন পার্বত্য জেলাকে নিয়ে একটি ইসলামী জঙ্গী গোষ্ঠীর নতুন একটি ইসলামিক রাষ্ট্র কায়েমের যে অভিপ্রায় ও ষড়যন্ত্র এটি তারই এক অংশ কিনা তাও উড়িয়ে দেয়া যায় না।

বস্তুত দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই এই ইসলামীকরণের ষড়যন্ত্র শুরু হয়। তবে এই কার্যক্রম আরও জোরদার হয় আশির দশকের শুরুতে ১৯৭৯-৮০ সালের দিকে হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দেশের সমতল অঞ্চল থেকে ৪-৫ লক্ষ বহিরাগত সেটেলার বাঙালি পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে জুম্মদের জায়গা-জমিতে বসতিদানের মধ্য দিয়ে। ১৯৮০ সালের দিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি জেলার লংগদুতে সৌদি আরব ও কুয়েতের অর্থায়নে স্থাপন করা হয় ইসলামিক মিশনারী সংগঠন 'আল রাবিতা'। এর রয়েছে হাসপাতাল ও কলেজ।

কার্যত এর প্রদান উদ্দেশ্য ইসলামী ভাবধারাকে সম্প্রসারিত করা, সেটেলার বাঙালিদের সহায়তা এবং আদিবাসী জুম্মদের ইসলামে ধর্মান্তরিতকরণের প্রচেষ্টা চালানো। এই প্রতিষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক দেখা যায় মূলত জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাথে। লংগদু ছাড়াও, রাঙ্গামাটির বরকল উপজেলায় এবং বান্দরবানের আলিকদম উপজেলায়ও এর হাসপাতাল রয়েছে বলে জানা যায়। ১৯৯০ সালে আল রাবিতা মিশনারি কেন্দ্র আলীকদমে ১৭ জন মারমাকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করে।

বস্তুত এই ধর্মান্তরিতকরণের ফলাফল বা পরিণতি যে আদিবাসী জুম্মদের সংখ্যালঘুকরণ, তাদের উপর সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বা তাদের সংস্কৃতি ধ্বংসকরণ, তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনধারায় ক্ষতিসাধন, জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চলকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণতকরণ, সর্বোপরি জুম্মদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে জাতিগতভাবে বিলুপ্তকরণেরই নামান্তর, তা বলাইবাহুল্য।

> দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া যে কত বড় মারাত্মক, তা বলে শেষ করা যায় না। দুর্নীতি যদি আমরা দূর করতে না পারি, তাহলে সরকার যত রকমের আইনই করুক না কেন, যত কড়া নির্দেশনামাই দিক না কেন, কোন সুরাহা হবে না। আজকে এই দুর্নীতি সবখানে। ..এই দুর্নীতিকে আঁকড়ে ধরে যারা কালো টাকা রোজগার করে, আইনের ছত্রছায়ায় তাদেরকে রক্ষা করা হয়। – *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা
১৯৩৯-১৯৮৩

আজকে খসড়া সংবিধান যদি এই গণপরিষদ-এ এইভাবে গৃহীত হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আমার যে আপত্তি আছে, সে আপত্তি হল, আমার বিবেক, আমার মনের অভিব্যক্তি বলছে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা পুরোপুরি এই খসড়া সংবিধানে নাই। যদি বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মনের কথা এই সংবিধানে থাকত, তাহলে আমার আপত্তির কোন কারণ থাকত না।

—মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত
ফোন: +৮৮-০৩৫১-৬১২৪৮, ই-মেইল: pcjss.info@gmail.com, ওয়েব: www.pcjss.org

শুভেচ্ছা মূল্য : ৫০ টাকা